গ্রাম রোজগার সেবক ও MGNREGS সুপারভাইজারদের বিষয়-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা

(খসড়া)

AHEAD Initiatives

গ্রাম রোজগার সেবক ও MGNREGS সুপারভাইজারদের বিষয়-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা

(খসড়া)

AHEAD Initiatives

সূচিপত্র

১। বাস্তুভিটা সংলগ্ন জমির উন্নয়নের ছোট ফল বাগান ও বহুবর্ষজীবি সব্জিবাগান বিষয়ে প্রশিক্ষণ ৫

২। নার্সারী তৈরির প্রশিক্ষণ ১৩

৩। আফটার স্কুলে মিশ্রফল বাগানের চাষ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ ১৭

৪। কঞ্চি কলম তৈরির প্রশিক্ষণ ২৪

৫। আফটার স্কুলে কলমের মাধ্যমে চারা তৈরিরর প্রশাক্ষণ ৩৪

৬। সহজে অ্যাজোলা প্রশিক্ষণ ৪০

৭। সহজে কেঁচোসার প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ ৪৫

৮। আফটার স্কুলে ঘরোয়া ভাবে হাঁস মুরগীর খাবার তৈরির প্রশিক্ষণ ৫০

৯। সহজে মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে জঙ্গল তৈরির প্রশিক্ষণ ৫৪

১০। সহজে ভেষজ উদ্ভিদ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ৬০

১১। আফটার স্কুলে ঘরোয়া ভাবে চৌবাচ্চায় শিঙ্গি-মাগুর মাছ চাষের প্রশিক্ষণ ৭৭

১২। আফটার স্কুলে ঘরোয়া ভাবে শিঙ্গি-মাগুর মাছের ডিম ফোটানোর প্রশিক্ষণ ৮১

১৩। আফটার স্কুলে বদ্ধ জলশয়ে কৃত্রিম ভাবে মাছের ডিম ফোটানোর প্রশিক্ষণ ৮৮

১৪। আফটার স্কুলে ঘরোয়া ভাবে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার ৯৪

১৫। আফটার স্কুলে হাইড্রোপনিক্স মিশ্রণ প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ ৯৮

বাস্তুভিটা সংলগ্ন জমির উন্নয়নের মাধ্যমে ছোট ফল বাগান ও বহুবর্ষজীবি সব্জিবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ (১) কোদাল (২) খুরপি বা নিড়ানি (৩) শাবল (৪) বাঁশের দন্ড বা খুঁটি (৫) লম্বা দড়ি (৬) ছুরি (৭) ঝাঁঝরি (৮) জৈব সার - শুকনো গোবর বা কেঁচো সার (৯) চালুনি (১০) যে বাস্তুভিটাতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ হবে সেই স্থান নির্বাচন করে রাখা (১১) ৫ রকম ফলের চারা (১২) ঋতু অনুযায়ী সব্জি বীজ (১৩) বহুবর্ষজীবি কিছু ফসল

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৪ ঘঃ ৩০ মি

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১০ মিনিট
২)	প্রশিক্ষার্থীদের সাথে ঘরোয়া সব্জিবাগানের উপযোগীতা ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
৩)	প্রশিক্ষার্থীদের সাথে ঘরোয়া সব্জিবাগানের বৈশিষ্ট নিয়ে আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
৪)	বোর্ড ও বোর্ড পেন ব্যবহার করে ঋতুভেদে প্রশিক্ষার্থীদের সাথে ঘরোয়া সব্জিবাগানের জন্য সারা বছরের ফসল নিয়ে আলোচনা	১৫ মিনিট
৫)	ঘরোয়া সব্জিবাগানের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষার্থীদের সাথে “HOME GARDEN.ppt” পাওয়ারপয়েন্টের মাধ্যমে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব	২৫ মিনিট
৬)	প্রশিক্ষার্থীদের বাস্তুভিটা সংলগ্ন জমির উন্নয়নের মাধ্যমে ফল বাগান ও বহুবর্ষজীবি সব্জিবন বিষয়ক হ্যান্ডবিল বিতরণ	১০ মিনিট
৭)	হ্যান্ডবিল - এর প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির পর্যালোচনা	১৫ মিনিট
৮)	ভিডিও দেখানো হবেঃ “মালা বৌদির পুষ্টি বাগান- mp4”	১০ মিনিট
৯)	বোর্ড ও বোর্ড পেন সহযোগে প্রশিক্ষার্থীদের সাথে যে ভিডিও দেখানো হল সেটিকে কেন্দ্র করে বাগান প্রস্তুতির পরিকল্পনা -	৩০ মিনিট
১০)	প্রশিক্ষার্থীদের সাথে সব্জি বাগানে জলের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা	১৫ মিনিট
১১)	বাগানে পোকামাকড়, মুরগী ও পাখি তাড়ানোর উপায়	২০ মিনিট
১২)	হাতে কলমে বাস্তুভিটা সংলগ্ন জমির উন্নয়নের মাধ্যমে ফল বাগান ও বহুবর্ষজীবি সব্জিবন প্রস্তুতিপর্ব	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

বাস্তুভিটা সংলগ্ন এক চিলতে জমিতে সব্জিবাগান ও ফলগাছ রোপণ

ঘরোয়া সব্জিবাগানের বৈশিষ্টঃ

১। বাস্তুভিটা সংলগ্ন এক চিলতে জমি ব্যবহার করেই সারা বছর ধরে ব্যবহারের উপযোগী ঘরোয়া সব্জিবাগান তৈরী করা যায়।

২। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বড় ফলের গাছ কম রাখতে হবে যাতে রোদ না আটকায়।

৩। অল্প ছায়াযুক্ত জমিতে আদা, হলুদ, কচু প্রভৃতি লাগাতে হবে।

৪। এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে বাড়ির রান্না ঘরের জল, স্নানের জল ঘরোয়া সব্জিবাগানের সেচের কাজে ব্যবহার করা যায়

৫। ফসল নির্বাচন এমনভাবে করতে হবে যাতে জমি কোন সময় খালি না থাকে

৬। ঘরোয়া সব্জিবাগানে সবসময় একটা শুঁটি জাতীয় সব্জি যেমন – সীম, বরবটি প্রভৃতি চাষ করতে হবে।

৭। লতা জাতীয় গাছ যেমন – লাউ, কুমড়ো, ঝিঙা, কুঁদরী প্রভৃতি বেড়ার উপর বা মাচা করে বা বাথরুমের চালে তুলে দিতে হবে (বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিম দিকে)।

৮। খেয়াল রাখতে হবে বাগানের উত্তর দিকে লম্বা জাতের সব্জি বা ফল যেমন – পেঁপে, কলা, সজনে ইত্যাদি লাগাতে হয়।

৯। ফসল সবসময় সারিতে লাগাতে হবে।

১০। একই বেডে একই গোত্রের সব্জি পর পর না লাগানোই ভাল।

১১। জমিতে যথা সম্ভব জৈব সার ব্যবহার করতে হবে, রাষায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার না করাই ভাল।

ঘরোয়া সব্জিবাগানের উদ্দেশ্যঃ

১। সারা বছর ধরে স্বল্প ব্যয়ে পরিবারের খাবার জন্য রাষায়নিক বর্জিত জৈব সারে প্রস্তুত পুষ্টিকর টাটকা উন্নতমানের ফল ও সব্জি পাওয়া

২। নিজের পছন্দমত ফল, সব্জি ফলানো যায়

৩। অপুষ্টি জনিত রোগ থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাওয়া যায়।

৪। বাড়ির আবর্জনা, আগাছা ইত্যাদি পচিয়ে সার করে বাগানে ব্যবহার করা যায় ফলত বাড়ির চারপাশ পরিস্কার থাকে।

৫। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের মতে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন গড়ে ২৮০ গ্রাম সব্জি খাবার প্রয়োজন যার মধ্যে ১১০ গ্রাম শাকপাতা জাতীয়, ৮৫ গ্রাম ফল-সব্জি জাতীয়, ৮৫ গ্রাম অন্যান্য সব্জি এবং ৯০ গ্রাম ফল থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ঘরোয়া সব্জিবাগান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতিঃ

(১) কোদাল (২) খুরপি বা নিড়ানি (৩) শাবল (৪) বাঁশের দন্ড বা খুঁটি (৫) দড়ি (৬) ছুরি (৭) ঝাঁঝরি (৮) জৈব সার (৯) চালুনি

ঘরোয়া সব্জিবাগানের জন্য সারা বছরের ফসলচক্রঃ

ভাদ্র – কার্তিকঃ মুলা, পালং, বাঁধাকপি, লংকা, টমেটো, বীন, ক্যাপ্সিকাম, ভেন্ডি, লেটুস, পালং, সীম, বেগুন

অগ্রহায়ণ – মাঘঃ বাঁধাকপি, লংকা, টমেটো, মুলা, পালং, মটরশুটি, বীট, গাজর, ফুলকপি, বীন

ফাল্গুন – বৈশাখঃ ডাঁটা শাক, উচ্ছে, ভেন্ডি, ঝিঙ্গে, বেগুন, শশা, লংকা, বরবটি, পিঁয়াজ

জৈষ্ঠ – শ্রাবণঃ কলমী, লংকা, নটে, ডাঁটা, পুঁই শাক, বেগুন, করলা, ঝিঙ্গে, কচু

ঘরোয়া সব্জিবাগান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাঃ

সবসময়ই লক্ষ্য রাখা দরকার বাস্তুভিটা সংলগ্ন যে জায়গাটুকুতে সকালের দিকে বেশীরভাগ সময় রোদ পৌছাতে পারে সেখানেই সব্জিবাগান করতে হবে। তবে বাড়ির অবস্থান অনুযায়ী এবং আরো অন্যান্য সুবিধা – অসুবিধা অনুসারে যে জায়গাটিতে সব্জি ও গাছপালা লাগানো হয় তা সবসময় বাড়িটির সবথেকে ভালো বা আদর্শ জায়গা নাও হতে পারে কারন বাড়ির অবস্থান পাল্টানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী করলে ভিটে বাড়ির চারিধারে আশে-পাশের জায়গাটুকে থেকেই আমরা সারা বছরের সব্জির যোগান পেতে পারি।

ভিটে বাড়িতে সব্জি বাগান করার ক্ষেত্রে যে সব সব্জি ও ফলগুলির কথা আমরা সবার আগে ভাববো সেগুলি থেকে যেন বছরের অধিকাংশ সময়-ই সব্জি ও ফল পাওয়া যায় যেমন – পেঁপে, বকফুল, নজনে, কাঁচকলা, লেবু, কামরাঙা সীম ইত্যাদি গাছগুলো থেকে প্রায় সারা বছরই সব্জি ও ফল পাওয়া সম্ভব তাছাড়া এইসব ধরণের গাছগুলি একবার লাগালে বহুদিন থাকে। এই কারনে এই গাছগুলিকে বাড়ির বেড়ার দিকে লাগালে ভালো হয়।

ঘরোয়া সব্জিবাগান থেকে সারা বৎসর কিছু পেতে গেলে কয়েকটি জিনিষ মনে রাখতে হবে

১। বাড়ির চারদিকের বেড়ার ব্যবহার করতে হবে

২। বাড়ির চালের ব্যবহার করতে হবে

৩। বাথরুমের চালের ব্যবহার করতে হবে

৪। মাচার ব্যবহার করতে হবে

৫। বেডের ব্যবহার করতে হবে

পেঁপেঃ

পেঁপে গাছ অবশ্যই রৌদ্রযুক্ত স্থানে লাগানোই ভালো এবং কমপক্ষে তিনটি পেঁপে গাছ লাগানো উচিত। পেঁপে ধরতে শুরু করলে নীচের দিক থেকে পেঁপে তুলে নেওয়া দরকার। সব পেঁপে গাছে রেখে দিলে ডগার দিকে যেসব ফল ধরে সেগুলি আকারে ছোট হবে। পেঁপের চারা যে খুব শীত বা খুব বর্ষাতে না লাগানোই ভালো। যেহেতু পেঁপে সারা বছর ধরেই পাওয়া যায় তাই সব্জিবাগানের ক্ষেত্রে পেঁপে গাছকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

কাঁচাকলাঃ

একবার লাগালে একবছরের পর থেকে ফল পাওয়া যাবে, কাঁচাকলা চারা বাড়ির সারগাদা বা কলতলার পাশে লাগালে ভালো হয়। কলাগাছ লাগানোর সময় গোঁড়ার তলার দিকের মুথার একটু অংশ থাকলে ভালো হয়। কলাঝাড়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখা দরকার যেন ১ টা বড়, ১টা মাঝারী ও ১টা ছোট গাছ থাকে। প্রতি ঝাড়ে ৩ টির বেশী কখনো না হয়।

বকফুলঃ

বীজ থেকে চারা তৈরী করে লাগানো যায়। বকফুলের কচি ডাঁটা ও ফুল খাওয়া যায় তাছাড়া মাঝারী ছায়াযুক্ত স্থানেও বকফুল হয়ে থাকে। তাই ভিটের একেবারে অব্যবহৃত জায়গায় বা বেড়াতে একবার একটা বকফুল গাছ লাগিয়ে দিলে প্রতি বছরই গাছটি থেকে আমরা পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সব্জি পাব।

সজনে/নজনেঃ

সজনে বা নজনে গাছের পাতা, ফুল, ডাঁটা সব খাওয়া যায় ও অত্যন্ত সুস্বাদু তাছাড়া নজনে তো বছরের প্রায় সবসময় হয়ে থাকে। এই পুষ্টিকর ও সুস্বাদু সব্জিকে সব্জিবাগানে লাগানোর জন্য পেঁপের পরই ভাবার দরকার আছে।

সজনে বা নজনে গাছের ডাল ফাল্গুন-চৈত্র মাস নাগাদ লাগাতে হবে। আগে স্যাঁতস্যাঁতে ছায়াযুক্ত স্থানে ডাল লাগিয়ে চারা তৈরী করে সেই চারায় শিকড় বার হবার পর সাধারণত ৩-৪ হাত লম্বা ও ৩-৪ ইঞ্চি মোটা ডাল ১ হাত মত গর্ত করে গর্তে কম্পোষ্ট, নিমখোল খুব ভালো করে মিশিয়ে শিকড়সহ ডাল টি পুঁতে দিতে হবে, খুব ভালো হবে যদি ডাল টি পুঁতে দেবার পর মাথায় একটু কাঁচা গোবর লাগিয়ে রাখা হয়। ভিটের বেড়ার ধারে যেখানে ভালো সূর্যালোক আসে এমন জায়গায় লাগাতে হবে।

ডাল টি লাগানোর সময় নিম বা রেড়ির খোল গর্তের মাটিতে মেশালে উঁইপোকা বা অন্যান্য পোঁকা লাগবে না। তাছাড়া এই গাছে খুব শুঁয়োপোকা হতে দেখা যায় এজন্য গাছের গুড়িতে মোটা ও গোল করে চুন লাগিয়ে দিলে শুঁয়োপোকার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ওলঃ

সব্জিবাগানে ওল লাগালে তার থেকে অনেকটা পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যায়। বেড়ার আশেপাশে দু – চারটে ওলগাছ থাকলে ভালো হয়। ফাল্গুনের শেষে বা চৈত্র মাসে গর্ত খোড়া হবে ও দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৃষ্টিতে ওল লাগানো যাবে। গর্ত চওড়া ভাবে করতে হবে এবং মাটি আলগা রাখতে হবে তারপর গোবর, কম্পোষ্ট সার, শুকনো ছাই মিশিয়ে মাটি ভালো করে তৈরী করতে হবে। গর্তের আয়তন বড় করলে ওল আকারে বড় হতে পারে। সাধারণত ২০০ – ৫০০ গ্রামের চোখযুক্ত ওলের কন্দ লাগালে ঠিক হয়।

ওলবীজগুলিকে প্রথমে গোবর জলে ধুয়ে নিতে হবে তারপর এগুলি সামান্য শুকিয়ে লাগাতে হবে। ওল লাগানোর ২০-২৫ দিন পর যখন চারা বার হবে তখন এর উপরে ভালভাবে গোবর সার ও মাটি চাপা দিতে হবে। ওল লাগানোর সময় মাটিতে শুকনো নিমপাতা গুড়ো বা নিমখোল দিয়ে লাগালে উঁই বা পিঁপড়ে লাগানোর সম্ভাবনা কমে।

লেবুঃ

ঘরোয়া সব্জিবাগানে লেবু লাগানোর জন্য রৌদ্রযুক্ত জায়গা বেছে নিতে হবে কারণ ছায়াতে একেবারেই লেবু গাছ ভালো হয় না। লেবুগাছ ঝোপযুক্ত হয় তাই বাড়ির একধারে রৌদ্রযুক্ত জায়গায় এর কলম লাগিয়ে দিলে বছরের সবসময় বাড়ির প্রয়োজনীয় খাবার লেবু পাওয়া যাবে যা "ভিটামিন – সি" – এর একটি ভালো উৎস। লেবু গাছের কলম লাগানো সময় বিশেষ করে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যেমনঃ

ক) যাতে রোগপোকার আক্রমণ না হয় সেজন্য গাছগুলি লাগানোর সময় গর্ত খুড়ে মাটিতে গোবর সার মেশানোর সময় কিছুটা শুকনো নিমপাতার গুড়োও মেশানো দরকার।

খ) যে চারাগুলি লাগানো হবে সেগুলি আগের দিন একটু জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে এবং চারা লাগিয়ে পরিমাণ মত জল দিতে হবে।

গ) লেবুর চারাগুলি লাগানোর সময় গর্ত তে অল্প জল দিয়ে সেই জলটা মাটি শুষে নেবার পর চারাটি লাগিয়ে মাটি চাপা দিলে ভালো হয়।

ঘরোয়া সব্জিবাগানে গাছ লাগানোর পরিকল্পনাঃ

ঋতু অনুযায়ী বেডে গাছ লাগানোর সময় বেডের মাঝে সব্জি চারাগুলি লাগানো হবে তবে লক্ষ্য রাখতে হবে নালার ধারে বা বেডের পাশে রাস্তার মধ্যে গাছের ডালপালা বেড়ে গিয়ে চলে না আসে। প্রতি বেডে ২-৩ ধরণের বেশী সব্জি লাগানো উচিত নয়। সাধারণত বেডে শাকের বীজ ফেলে দিলে তার মধ্যে মধ্যে ফল জাতীয় গাছ লাগিয়ে দিলে সব্জি গাছটি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার শাক খাওয়া যাবে। তাছাড়া যেসব সব্জিগুলি মাটিতেই লতা ছাড়ে (যেমন মিষ্টি আলু ইত্যাদি) সেগুলি তার মাঝে মাঝে ফল জাতীয় গাছ লাগালে সব্জি ও শাক দুটোই পাওয়া যাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে মরশুমে যে বেডে যে যে সব্জি হবে পরবর্তী সেই মরশুমে সেই সেই বেডে একই ফসল না করা ভালো, বেড অনুযায়ী ফসল পরিবর্তন করতে হবে নাহলে মাটির গুণগত মান কমে যাবে এবং ফসল ঠিকমত ফলবে না তাছাড়া ফসলে রোগও দেখা দেবার সম্ভাবনা প্রবল থাকে।

শিম, কুঁদরী এইধরণের সব্জিগুলি যেহেতু লতানে হয় সেজন্য বেড়াতে এগুলি দিয়ে দিলে ভালো হয় আর বেড়ার ভিতরের দিকে বেড়া ধরে অড়হড় লাইন করে লাগিয়ে দিলে ডালও পাওয়া যাবে। এছাড়া মাচা করে লতানে সব্জি লতিয়ে দেওয়া যাবে পাশাপাশি বাথরুমের চালেও তুলে দেওয়া যেতে পারে।

জলের ব্যবহারঃ

সব্জি লাগানোর পর সেগুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য জল দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে এক এক জেলায় জলের সমস্যা এক এক রকম। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলা খরাপ্রবণ তাই এক ফোঁটা জল নষ্ট করা যায় না, আবার কিছু জায়গায় জলে উৎস বাড়ির কাছাকাছি না হওয়ায় দূর থেকে জল আনতে হয়। এসব ক্ষেত্রে বাড়ির হাতমুখ ধোয়া, বাসনপত্র ধোয়া, স্নান করার জল আমরা অনায়াসে সব্জিবাগানে দিতে পারি।

১। মাটিতে কটি গর্ত করে একটি কলসী/মালসা বসানো হল

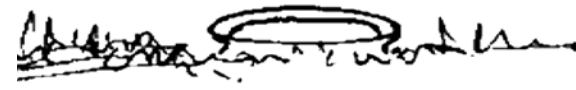

২। কলসী/মালসাটি একেবারে গর্তের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল

৩। কলসীর মুখ ঢেকে দেবার জন্য একটি বড় প্লাস্টিক সীট পেতে দেওয়া হল

৪। কলসীর মুখের ঠিক ওপরে প্লাস্টিক সীটে কয়েকটি ফুটো করে দেওয়া হল

৫। বাচ্চাকে স্নান করানোর সময় বা তরিতরকারি অথবা হাতমুখ ধোবার সময় ঐ ব্যবহৃত জল ফুটোর মধ্যে দিয়ে কলসীতে জমা হবে

১। কলসী

২। কলসীর গায়ে নির্দিষ্ট দুরত্বে ছোট তিনটি ফুটো করা হল

৩। ফুটোর ভেতর দিয়ে কাপড়ের পলতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে

৪। কলসীর ভেতরের জল ঐ ফুটো দিয়ে চুঁইয়ে মাটিতে মিশবে

৫। যেখানে বাগান করবেন, বা গাছ লাগাবেন সেখানে আগেই একটি গর্ত খুঁড়ে রাখুন

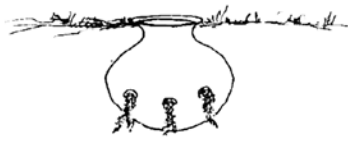

৬। সেই গর্তে কলসীটা সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দিন মখটা খোলা রাখন

৭। কলসীর মুখে একটি ঢাকনা দিন

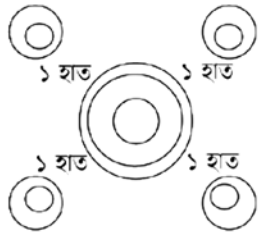

৮। কলসীটি মাঝখানে রেখে নির্দিষ্ট দুরত্বে চারপাশে গাছ লাগাতে পারবেন

৯। কলসী থেকে জল চুঁইয়ে আস্তে আস্তে মাটিতে মিশবে এবং চারদিকে লাগানো সবজি গাছের জলের যোগান দেবে

ঢাকনা খুলে মাঝে মাঝে দেখতে হবে। জল না থাকলে জল দিতে হবে। জল দেবার পর ঢাকনা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন।

ঘরোয়া সব্জিবাগানের মুরগী ও পাখি তাড়ানোঃ

বাগানে এই সমস্যা একটি সাধারণ সমস্যা। বেডে বীজ ফেললে তা থেকে চারা বেরোনোর সাথে সাথেই শুরু হয় এই সমস্যা। খুব সহজেই কিন্তু এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

সারা বছরের ঘরোয়া সব্জি বাগানের জন্য বাস্তুভিটা সংলগ্ন ১ শতক জমির ব্যবস্থাপনা

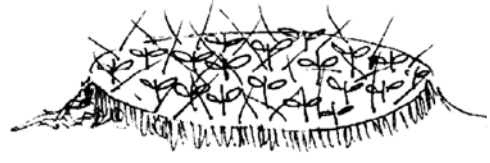

চাড়াগুলোর মাঝে মাঝে এলোপাথাড়ি ভাবে কাঠি পুঁতে দিলে মুরগী পাখি ছোট ছোট চারাগুলো নষ্ট করতে পারবে না কারণ এতে মুরগী বা পাখীদের খোঁচা খাওয়ার সম্ভবনা থাকে

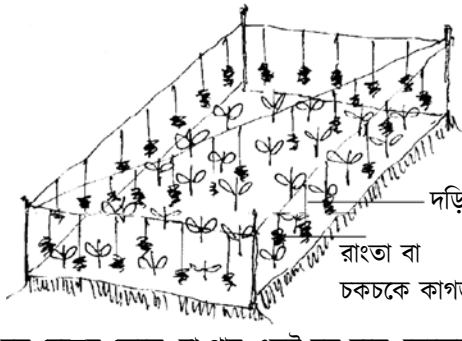

বড় বেডের ক্ষেত্রে, বা গাছ একটু বড় হলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আর একটি পদ্ধতি নেওয়া যেতে পারে।

বেডের চারপাশে খুঁটি দিয়ে তাতে বাড়ীতে পড়ে থাকা দড়ি বেঁধে নিলেন। এই দড়িতে রাংতা বা অন্য চকচকে কাগজ ঝুলিয়ে, ছিবর মত। এমনভাবে কাগজগুলি বাঁধবেন যাতে করে হাওয়া দিলেই দুলতে থাকে।

এর ফলে মুরগী বা পাখি ভয় পাবে ও সবজি বাগানের দিকে এগোবে না।

বাস্তুভিটা সংলগ্ন ১ শতক জমিতে সব্জিবন ও ফলগাছ রোপণের একটি আদর্শ পরিকল্পনাঃ

১। বাস্তুভিটা সংলগ্ন ফাঁকা জমি কুপিয়ে সঠিক ভাবে প্রস্তুতিকরণ

২। ৪ থেকে ৪১/২ চওড়া করে মাটি থেকে একটু উঁচু করে সারাদিন ধরে মোটামুটি রৌদ্র পায় এমন জায়গায় ৩ টি বেড তৈরী করতে হবে

৩। ১টি মাচা তৈরী করতে হবে

৪। বাস্তুভিটা সংলগ্ন ফাঁকা জমি ঘিরে যদি বেড়া না থাকে বেড়া দিতে হবে

৫। বেড়ার চারিধারে অড়হড়ের বীজ লাগিয়ে দিলে তা থেকে সারা বছরের ডালের যোগান হয়ে যাবে।

৬। কলের পাশে বা সার গাদার পাশে কাঁচাকলা ও পাকা কলার গাছ লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

৭। বাস্তভিটার বিভিন্ন কোণে আম, পেয়ারা, লেবু, সজনে বা নজনে, বেদানা প্রভৃতি গাছ লাগাতে হবে তবে লেবু গাছ যেন ছায়াযুক্ত স্থানে না লাগানো হয়।

৮। বেড়াতে লাফা বরবটি, সীম, কুঁদরী প্রভৃতি লতানে গাছ লাগানো যেতে পারে।

৯। ঘর এবং বাথরুমের চালে ঋতুভেদে কুমড়ো, লাউ, চালকুমড়ো, সীম প্রভৃতি লাগানো যায়।

১০। ঋতুভেদে মাচাতে করলা, ঝিঙ্গে, চিচিঙ্গা, মটরশুটি, বীন, কুঁদরী প্রভৃতি করা যায়।

১১। ৩ টি বেডে ঋতুভেদে বিভিন্ন শাক-সব্জি করা হবে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ডেভেলপমেন্ট সিরার্চ কমিউনিকেশন এন্ড সার্ভিসেস সেন্টার ও লোক কল্যাণ পরিষদ

নার্সারী তৈরির প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন, কিছু ঝুরো মাটি, কোদাল, চালুনি, গোবর সার বা কেঁচোসার, নার্সারী পলি প্যাকেট, চাকু, বালতি/ঝারি, মগ, জল, ঝুড়ি, ১টি গোলা সাবান, অল্প পরিমাণ কেরোসিন তেল, লম্বা দড়ি, স্টীল টেপ, নিম খোল

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৪ ঘন্টা

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১৫ মিনিট
২)	প্রশিক্ষার্থীদের সাথে বর্তমান দিনে গাছ রোপণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা ও "গ্লোবাল ওয়ার্মিং.mp4" ভিডিও প্রদর্শণ	৩০ মিনিট
৩)	প্রশিক্ষার্থীদের সামনে পাওয়ারপয়েন্টের (NURSERY ER DHAP.ppt) সাহায্যে নার্সারীর বিভিন্ন ধাপগুলো তুলে ধরা	১৫ মিনিট
৪)	প্রশিক্ষার্থীদের নার্সারীর জন্য বীজ সংগ্রহ, বীজ শোধন এবং স্বাতেজিকরণ সম্পর্কেপাওয়ারপয়েন্ট(BEEJSONGROHO-SODHON-SWATEJIKARON.ppt) ও বক্তৃতার মাধ্যমে এক সম্যক সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান	৩০ মিনিট
৫)	নার্সারী প্রস্তুতিকরণের প্রতিটি ধাপ (উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন, মাটি প্রস্তুতিকরন, সার ও মাটি মিশ্রণ, নার্সারীর বেড, মালচিং, শিফটিং প্রভৃতি) নিয়ে পাওয়ারপয়েন্টের মাধ্যমে বোর্ড ও পেন এর সহায়তায় আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব	৬০ মিনিট
৬)	চারা গাছের রোগ, পোকা ও খুব সহজে ঘরোয়াভাবে তার দমন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা ও হাতে কলমে প্রস্তুতি (যেমন নিম খোলের দ্রবণ, সাবান – কেরোসিনের দ্রবণ প্রভৃতি)	৬০ মিনিট
৭)	অন্তিম আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব	৩০ মিনিট
৮)	প্রশিক্ষার্থীদের "সহজ ভাবে নার্সারী তৈরী" – লিফলেট এবং "নার্সারী" পুস্তিকাটি বিতরণ	

সহজ ভাবে নার্সারী

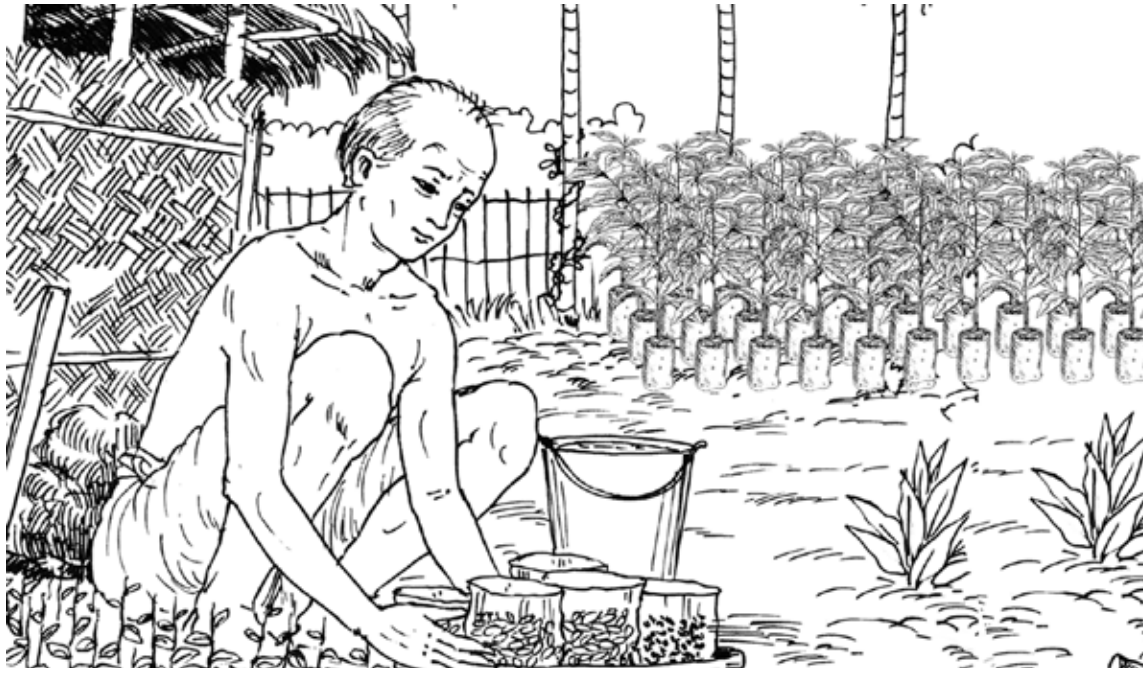

১। নার্সারীর উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন

আলোছায়া জায়গা ; জলের ব্যবস্থা ; জল নিকাশী ব্যবস্থা ; বাড়ির কাছে ; উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

২। উপযুক্ত মাটি নির্বাচন

দোঁয়াশ মাটি ; আলু, গম, সরিষার জমি থেকে মাটি সংগ্রহ না করা ; পতিত জায়গা থেকে মাটির উপরি ভাগের ৪" – ৬" গর্ত করে ফেলে দিয়ে তার নিচের অংশ থেকে মাটি নিতে হবে।

৩। মাটির ধরণ অনুযায়ী মিশ্রণ

ক) যদি বেলে মাটি হয়, তাহলে ১ ঝুড়ি বেলে মাটির সাথে ১ ঝুড়ি এঁটেল মাটি মেশাতে হবে

খ) যদি এঁটেল মাটি হয়, তাহলে ১ ঝুড়ি এঁটেল মাটির সাথে ১ ঝুড়ি বেলে মাটি মেশাতে হবে

৪। মাটির সাথে কম্পোষ্ট/গোবর সারের মিশ্রণ

৩ ঝুড়ি মাটির সাথে ১ ঝুড়ি গোবর মেশাতে হবে

প্রয়োজনে অর্ধেক অর্ধেক হতে পারে

মাটির সাথে ছাই মেশান যাবে না

মাটির সাথে সার মেশানোর পর কোয়ার্টার ইঞ্চি নেটের চালুনী দিয়ে মাটি চেলে নিতে হবে

৫। নার্সারী বেডের মাপ

প্যাকেটের মাপ অনুযায়ী বেডের মাপ হয়

যদি প্যাকেট ৪" x ৬"-৭" হয় তাহলে প্রতি ১০০০ এর জন্য ৭ হাত লম্বা ৩ হাত চওড়া ৬" গর্ত করে মাটি কেটে বাইরে ফেলে দিতে হবে

প্রয়োজনে বাইরে থেকে মাটি নিয়ে এসে ৬"-১২" উঁচু করে বেড বানাতে হতে পারে

৬। প্যাকেটে মাটি ভর্তি

প্যাকেটে ঝুরঝুরে মাটি এমন করে ভরতে হবে যেন প্যাকেট খুব শক্ত না হয়ে যায় আবার খুব নরম যেন না থাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে প্যাকেট যেন খালি না থাকে। প্যাকেটের নীচের দিকে যেন ৪-৫ টি ছিদ্র থাকে যাতে অতিরিক্ত জল বের হয়ে যায়

প্যাকেট অবশ্যই সারিবদ্ধ ভাবে সাজাতে হবে

৭। প্যাকেটে বীজ/চারা দেওয়ার পদ্ধতি

বীজের আকার প্রকার ও সহজাত ধর্মভেদে বিভিন্ন বীজ বিভিন্ন সময় অনুযায়ী জলে ভেজাতে হবে

বীজের আকার প্রকার অনুযায়ী প্যাকেটে সরাসরি দুটি আঙ্গুলে চাপ দিয়ে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে

কিছু কিছু বড় বীজ আছে যেগুলি আঙ্গুল দিয়ে চেপে প্যাকেটে ঢোকানো যাবে না। সেই ক্ষেত্রে অল্প মাটি প্যাকেট থেকে তুলে নিয়ে বীজ দিতে হবে, পরে ঐ হাতের মাটি দিয়ে ঢাকা দিতে হবে

কিছু কিছু বীজ আছে যেগুলি সরাসরি প্যাকেটে বীজ দেওয়া যায় না। সেগুলি মাদার বেডে চারা তৈরি করে প্যাকেটে দিতে হয়

৮। জল দেওয়ার পদ্ধতি

প্রয়োজন অনুযায়ী সকাল বিকালে ঝাড়ির সাহায্যে জল দিতে হবে

বালতি বা অন্য কোন ভাবে দেওয়া যাবে না

জল দেওয়ার পর অবশ্যই খড় অথবা শুকনো সুপারী পাতা দিয়ে প্যাকেটগুলি ঢাকা দিতে হবে

চারা ২"-৩" ইঞ্চি বের হলে ঢাকা সরিয়ে নিতে হবে

৯। ঢাকা/মালচ্ কেন

প্যাকেটের মাটি ধুয়ে ও শক্ত হয়ে যাবে না

আগাছা জন্মাবে না

প্রচন্ড রৌদ্রের তাপে মাটির আদ্রর্তা বজায় থাকবে, এক কথায় জল কম লাগবে

১০। কখন চারা শিফটিং করা উচিত

চারা যখন ৬" ইঞ্চি হবে তখন শিফটিং করা উচিত

অবশ্যই বৈকালে করা দরকার

সকালে উচিত নয়

শিফটিং করার পর বা মাদার বেড থেকে চারা তুলে প্যাকেটে (এটাও বৈকালে করা উচিত) দেওয়ার পর অবশ্যই ৩-৪ দিন তার উপরে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে

১১। চারা শিফটিং/নাড়াচাড়া কেন

বেডের ভিতর অনেক খালি প্যাকেট থাকে

প্যাকেটের চারার শিকড় মাটির নীচে চলে যায়, যার ফলে চারা স্থানান্তরিত করলে মারা যায়

কান্ড দূর্বল হয়

১২। বেড কয় প্রকার

বেড প্রধানত ৩ ধরনের

আকার প্রকার ভেদে বেড বিভিন্ন হয়

১৩। বীজ সংগ্রহ

কমপক্ষে ২০ বছর বয়সী সুস্থ সবল ও নিরোগ গাছ থেকে বীজ নেওয়া দরকার

সাধারণত বেশির ভাগ বীজ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সংগ্রহ করতে হয়

এমন কিছু বীজ আছে যা খেয়ে অথবা পাকা বীজ সঙ্গে সঙ্গে লাগাতে হয়। বেশীদিন সংরক্ষণ করে রাখলে গাছ বের হয় না

১৪। বীজ শোধন

গোমূত্র অথবা গোবর জলে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা

১৫। গাছের রোগ

ছোট অবস্থায় গাছের সাধারণত গোড়া পচা ও ধ্বসা রোগ হয়। তার জন্য কাঁচা টাটকা গোবর জল অথবা জল ও গোমূত্র মিশ্রণ (৪ ভাগ জল ও ১ ভাগ গোমূত্র) স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়

১৬। পোকার জন্য

ছোট অবস্থায় লেদা ও শুয়ো পোকার উপদ্রব হয়। তার জন্য সাবান কেরোসিনের দ্রবণ স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায় (৪ চা চামচ কেরোসিন দ্রবণ ও ২ চা চামচ দেশী গোলা সাবান প্রতি লিটার জলে গুলে মিশ্রণটি তৈরী করতে হবে।)

১৭। গাছ নির্বাচন

পশুখাদ্য, জ্বালানী, আসবাবি, ফলমূল, ভেষজ/বনৌষধি বা ব্যবসার জন্য চারা করলে এলাকার চাহিদা অনুযায়ী করা উচিত।

আফটার স্কুলে মিশ্রফল বাগানের চাষ পদ্ধতির প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরনঃ (১) বোর্ড, ডাস্টার, চক, বোর্ড পেন (২) ফলের চারা (৩) জৈব ও অজৈব সার (৪) চারা, কলম, তেউড় (৫) ফিতে (৬) ডাল ছাটাইয়ের যত্রপাতি (৭) গর্ত কাটার যত্রপাতি (৮) ঘেরার জন্য উপকরন (৯) দড়ি (১০) চুন বা ছাই (১১) খুটি (১২) চারা লাগানোর বিভিন্ন ছবি

দিনের সংখ্যা- ১ দিন	সময়- ৫ ঘন্টা

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে আলোচনার শুরু	১০ মিনিট
২)	মিশ্র ফল বাগানের সুবিধা ও উদাহারন	১০ মিনিট
৩)	ফল বাগানের নিচে ছায়া সহনশীল ফসলের নাম	২০ মিনিট
৪)	ফল বাগানের বিবেচ্য বিষয়	২০ মিনিট
৫)	ফল বাগানের আন্তঃপরিচর্যাঃ [(ক) জাত নির্বাচন (খ) জাত নির্বাচন (গ) জমি তৈরী (ঘ) চারা ও কলম নির্বাচন	৪৫ মিনিট
৬)	প্রশ্ন উত্তর পর্ব	২০ মিনিট
৭)	ফলের চারা রোপণের পদ্ধতিঃ ক) বর্গাকার পদ্ধতি খ) আয়তকার পদ্ধতি গ) ত্রিকোনী পদ্ধতি ঘ) কন্টুর পদ্ধতি ঙ) তারকাকৃতি পদ্ধতি	৪০ মিনিট
৮)	চারা রোপনের উপযুক্ত সময় পরিচর্যা	১৫ মিনিট
৯)	বিভিন্ন চারার দুরত্ব ও পরিচর্যা	১৫ মিনিট
১০)	গর্ত খনন ও মাপ ও পরিচর্যা	১০ মিনিট
১১)	প্রশ্ন উত্তর পর্ব	১০ মিনিট
১২)	চারা রোপণ ও পরিচর্যা	১৫ মিনিট
১৩)	ডাল ছাঁটাই ও পরিচর্যা	১৫ মিনিট
১৪)	সার প্রয়োগ ও জলসেচ পদ্ধতি	১০ মিনিট
১৫)	রোগ ও পোকার নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি	১০ মিনিট
১৬)	হাতে কলমে গর্ত কাটা, গাছ লাগানো, সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা	৩০ মিনিট
১৭)	প্রশিক্ষার্থীদের মিশ্র ফল বাগান সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ	৫ মিনিট

মিশ্র ফল বাগানের চাষ পদ্ধতি

একই জমিতে একই সময়ে বিভিন্ন উচ্চতার বিভিন্ন ফল চাষ করাকেই বলে বহুস্তর বিশিষ্ট মিশ্র ফল বাগান। এই ফল বাগানের জন্য অতি ঘন চাষ পদ্ধতির ব্যবহার করে সূর্যের আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়। বিভিন্ন উচ্চতার, বয়সের এবং গাছের শিকড়ের গঠনসহ অন্য সব বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে এ চাষ পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানো হয়। ভূমির উল্লম্ব (ভার্টিকাল) ব্যবহার সর্বোত্তমভাবে নিশ্চিত করাই হলো এই ধরনের চাষ পদ্ধতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে লম্বা আকার (Canopy) গাছের বৈশিষ্ট্য হলো অতি সূর্যালোক ও বাষ্পীয় ভবনের চাহিদা এবং সবচেয়ে খাটো আকার গাছের চাহিদা হলো ছায়া এবং অতি আর্দ্রতার। সাধাণত লম্বা গাছ প্রখর সূর্যালোক পছন্দ করে বিধায় উপরের স্তরে থাকে এবং খাটো আকারের গাছ ছায়া পছন্দ করে সেগুলো নিচের স্তরে থাকবে।

সুবিধাঃ

বহুস্তর বিশিষ্ট ফল বাগানে বিভিন্ন বিন্যাসের মাধ্যমে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় তা নিম্নে দেওয়া হলঃ

- এই ধরনের চাষ পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে একক জমিতে অধিক আয় পাওয়া যায়। একই জমি থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা যায়।
- চাষে ফলন ঝুঁকি কমায় এবং সারা বছর নিয়মিতভাবে ফলের সরবরাহ পাওয়া যায়।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে।
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন- অতি বৃষ্টি, ভূমিক্ষয় বা ভূমিধসের প্রভাব কমাতে সাহায্য করে।
- ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
- একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফল চাষ করার ফলে একক জমিতে ফলন বাড়ে এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে।

বহুস্তর বিশিষ্ট চাষ পদ্ধতির কিছু উদাহরণঃ

নারিকেল-পেয়ারা-আনারস/নারিকেল-পেঁপে-আনারস/নারিকেল-জলপাই-আনারস/নারিকেল-কাঁঠাল-কফি-পেঁপে-আনারস/নারিকেল-কলা-কচু/নারিকেল-আম-পেঁপে-ঢেঁড়স-মুলা-লালশাক/ডাঁটাশাক/নারিকেল-গোলমরিচ-আম-মাল্টা-পেঁপে-ঢেঁড়স-মুলা-লালশাক/ডাঁটাশাক/নারিকেল/সুপারি-মাল্টা-লেবু-আদা/হলুদ

বহুস্তর বিশিষ্ট ফল বাগানের নিচে আলো ছায়া সহনশীল ফসলের নাম

আনারস, মরিচ, হলুদ, আদা, মিষ্টিআলু, কুল, মসলা চাষ, বকফুল, জগডুমুর, বরাল, লেবু, আতা, গাব, জামরুল, বেল, কয়েত বেল, কামরাঙা, সফেদা, বাতাবি, বেদেনা, তেঁতুল ইত্যাদি

বহুস্তর বিশিষ্ট মিশ্র ফল বাগানের বিবেচ্য বিষয়গুলোঃ

১. বহুবর্ষজীবী ফল গাছ নির্বাচন

বহুবর্ষজীবী ফল গাছ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজন :

ক) সূর্যালোক পছন্দ করে, খ) স্থানীয় আবহাওয়া উপযোগী, গ) দ্রুতবর্ধনশীল, ঘ) বহুবিধ ব্যবহার, ঙ) হালকা

ছায়া প্রদান

বহুবর্ষজীবী ফল গাছ, যেমন- নারিকেল, আম, কাঁঠাল, জাম, পেয়ারা, মাল্টা, লিচু, ইত্যাদি

২. বর্ষজীবী ফল নির্বাচন

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় এনে এক বর্ষজীবী ফল গাছ নির্বাচন করা প্রয়োজন

ক) দ্রুতবর্ধনশীল, খ) আংশিক ছায়া পছন্দকারী, গ) খাটো জাত, ঘ) অধিক ফলন, ঙ) সহজে ফল আহরণ করা যায়

বর্ষজীবী ফল গাছ, যেমন - আনারস, কলা, পেঁপে।

৩. মরশুমি ফসল নির্বাচন

মরশুমি ফসল নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো

ক) ভালো জাত, খ) কভার ক্রপ হিসেবে কাজ করবে, গ) অঞ্চল ভিত্তিক মরশুম অনুযায়ী উপযোগী ফসল নির্বাচন, ঘ) দ্রুতবর্ধনশীল ও অধিক ফলন নিশ্চিত করবে, যেমন- চেরি টমেটো বিভিন্ন প্রকার শাকসবজি ও মসলা।

৪. অতিরিক্ত ফল গাছ অপসারণ

রোপণকৃত বাগানে গাছের বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বাগানে গাছ বেশি ঘন থাকলে গাছের বাড়-বাড়ন্ত কমে যাবে। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হয় এবং ফলন কমে যায়। তাই বাগানের গাছের সারিতে অতিরিক্ত গাছ অপসারণ করা প্রয়োজন। তবে খেয়াল রাখতে হবে অপসারণের সময় অন্য গাছ যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।

৫. অন্তরবর্তী পরিচর্যা

সময়মতো ডাল ছাঁটাই, আগাছা পরিষ্কার, সার ও কিটরোধক প্রয়োগ এবং সেচ ও জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬। প্রজাতি ও জাত নির্বাচন

মিশ্র ফল চাষের ক্ষেত্রে ফসলের প্রজাতি ও জাত নির্বাচন সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অঞ্চল ভিত্তিক মাটি ও জলবায়ুর বৈচিত্রেয অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ফলের বাণিজ্যিক চাষাবাদের সম্ভাবনা অনেক। যে এলাকায় বাগান তৈরি করা হবে সেই এলাকার উপযোগী ফলের প্রজাতি ও জাত বেছে নিতে হবে। প্রজাতি/জাত নির্বাচন সঠিক না হলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না।

৭। জমি নির্বাচন

রোপনের স্থান সঠিক হতে হবে। এর জন্য বসতবাড়ীর আশে পাশে এমন স্থান নির্বাচন করলে ভাল হয়। অধিকাংশ ফলগাছ জল সহ্য করতে পারে না, এই জন্য ফলের বাগানে যাতে বন্যা বা বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না এমন জমি ফল বাগান তৈরির জন্য নির্বাচন করতে হবে। তবে কিছু কিছু ফলগাছ যেমন- আম, পেয়ারা, নারিকেল, কুল স্বল্পকালীন জল সহ্য করতে পারে। এসব ফল মাঝারি উঁচু জমিতে রোপণ করা যেতে পারে। ফলগাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে না পারলেও তাদের বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য নিয়মিত সেচ প্রদান অত্যন্ত জরুরি। তাই জমি নির্বাচনের পূর্বে সেচের সুবিধা সম্পর্কে খেয়াল রাখতে হবে। ফল চাষের ক্ষেত্রে মাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাগানের মাটি অবশ্যই ফল উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত হতে হবে এবং মাটির পিএইচ অবশ্যই সর্বাপেক্ষা নিরপেক্ষ অবস্থায় (৬.৮

থেকে ৮.৫) থাকতে হবে। উর্বর বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ মাটি ফল চাষের জন্য জন্য উপযোগী।

৮। জমি তৈরি

গভীরভাবে চাষ ও মই দিয়ে উত্তমরূপে জমি তৈরি করতে হবে। আগাছা বিশেষ করে বহুবর্ষজীবী আগাছার মধ্যে উলু ও দুর্বা গোড়া ও শিকড়সহ অপসারণ এবং জমি সমান করতে হবে।

৯। চারা ও কলম নির্বাচন

মিশ্র ফল বাগান তৈরির ক্ষেত্রে সঠিক চারা-কলম নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চারা নির্বাচন সঠিক না হলে বাগান থেকে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে না। চারার বয়স, রোগ বালাইয়ের আক্রমণ, সতেজতা প্রভৃতি বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ এগুলো গাছের ফলন ক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ভালো চারা ও কলমের নিম্নলিখিত গুণাগুণ থাকবে-

ক) চারা ও কলমটি হবে ভালো বা উৎকৃষ্ট জাতের স্বাস্থ্যবান ও রোগমুক্ত চারা বা বীজ থেকে উৎপন্ন, খ) চারা ও কলমটির কান্ডের দৈর্ঘ্য শিকড়ের দৈর্ঘ্যের চেয়ে ৪ গুণের বেশি হবে না, গ) চারা ও কলমের বয়স এক বা দেড় বছরের বেশি হবে না, ঘ) চারা ও কলমে ফুল-মুকুল বা ফল থাকবে না, ঙ) চারাটি রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ মুক্ত হবে, চ) কলমের চারাটি হবে ২-৩টি সুস্থ-সবল শাখাযুক্ত, ছ) জোড় কলমের চারার আদিজোড় এবং উপজোড়ের মধ্যে সংগতি থাকতে হবে এবং সঠিকভাবে জোড়া লাগতে হবে।

আমের বেলায় জোড়কলমের চারা এবং বাতাবীলেবু ও পেয়ারার বেলায় গুটিকলমের চারা রোপন করা উত্তম। অন্যান্য গাছের বীজের চারা এবং কলার তেউড় রোপন করা যায়।

১০। বিভিন্ন প্রকার গাছ রোপন পদ্ধতি

ক। বর্গাকার পদ্ধতি (Square system) : এই পদ্ধতিতে রোপিত গাছ থেকে গাছ ও সারি থেকে সারির দূরত্ব সমান থাকে এবং দুই সারির পাশাপাশি চারটি গাছ মিলে একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করে এবং প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের কোণায় একটি করে গাছ লাগানো হয়। এই পদ্ধতিতে রোপিত প্রতিটি গাছের পাশে সমান জায়গা থাকায় গাছগুলো সুষমভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং বাগান দেখতেও সুন্দর হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত আম, লিচু, নারিকেল ইত্যাদি লাগানো হয়ে থাকে।

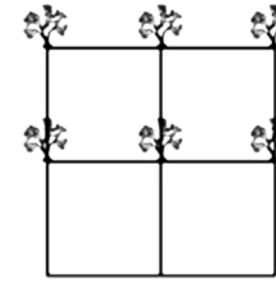

খ। আয়তকার পদ্ধতি (Rectangular system) : এই পদ্ধতি বর্গাকার পদ্ধতির অনুরূপ কিন্তু প্রধান ব্যবধান হচ্ছে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব সারি থেকে সারির দূরত্বের চেয়ে কম হয় বলেই দুই সারির পাশাপাশি চারটি গাছ মিলে একটি আয়তক্ষেত্র সৃষ্টি করে। এই পদ্ধতিতে লাগানো ফলবাগানে আন্তঃপরিচর্যা করা বেশ সুবিধাজনক। এই পদ্ধতিতে সাধারণত আম, কাঁঠাল, কুল, ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি লাগানো হয়ে থাকে।

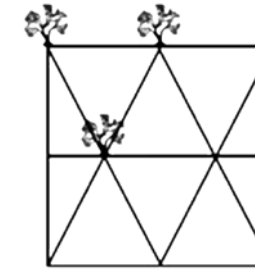

গ। তারকাকৃতি পদ্ধতি (Quincunx system) : এই পদ্ধতিতে আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি বহুবর্ষী গাছকে বর্গাকারে রোপণ করে পাশাপাশি দুই সারির চারটি

গাছ সমন্বয়ে গঠিত বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে একটি দ্রুতবর্ধনশীল ছোট ধরনের গাছ লাগানো হয়। এই অস্থায়ী গাছটিকে ফিলার বা পূরক গাছ বলা হয়। রোপিত আসল গাছগুলো যখন বৃদ্ধি পেয়ে সম্পূর্ণ জমি দখল করে তখন পূরক গাছগুলোকে অপসারণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে পূরক গাছ হিসেবে পেঁপে, কলা, পেয়ারা ফুটি, তরমুজ ইত্যাদি লাগানো হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে সাধারণত আম, কাঁঠাল, লিচু, ইত্যাদি লাগানো হয়ে থাকে।

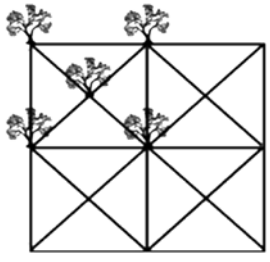

ঘ। ত্রিকোণী পদ্ধতি (Triangular system) : এই পদ্ধতিতে গাছ লাগালে পাশাপাশি দুই সারির তিনটি গাছ মিলে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তৈরি হয় অর্থাৎ যদি ১ম, ৩য় ও ৫ম সারিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে গাছ লাগানো হয় তবে ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ একান্তরক্রমিক সারিতে প্রথমোক্ত সারিসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে গাছ লাগাতে হয়। এই পদ্ধতিতে রোপিত গাছ তিনদিক থেকেই সারিবদ্ধ দেখায়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত আম, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি লাগানো হয়ে থাকে।

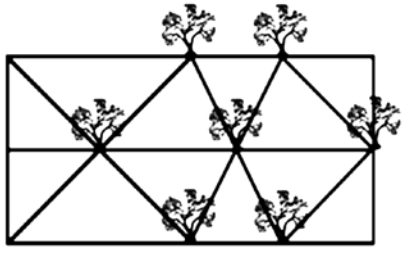

ঙ। ষড়ভূজী পদ্ধতি (Hexagonal system) : এই পদ্ধতি একটি সমবাহু ত্রিকোনী পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ এখানে পাশাপাশি দুই সারির তিনটি গাছ মিলে একটি সমবাহু ত্রিভূজ তৈরি হয় এবং পাশাপাশি তিন সারির ছয়টি গাছ মিলে একটি ষড়ভূজ তৈরি হয় যার কেন্দ্রেও একটি গাছ থাকে। একই দূরত্বে গাছ লাগালে সারি থেকে সারির দূরত্ব কমে যায়। ফলে নির্দিষ্ট জমিতে বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা এতে শতকরা ১৫টি গাছ বেশি সঙ্কুলান হয়। এজন্য এটিকে বাণিজ্যিক ফল বাগানে বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত আম, লিচু, পেয়ারা, কমলা, মাল্টা ইত্যাদি লাগানো হয়ে থাকে।

চ। কন্টুর পদ্ধতি (Contour system) : সাধারণত ঢালসম্পন্ন পাহাড়ী এলাকায় যেখানে জমির ঢাল ৩% এর বেশি হয় সেখানে এই পদ্ধতি অনূসরণ করা হয়। ঢাল ও উচ্চতা অনুসারে ভূমি থেকে পাহাড়ের ঢালে মোটামুটি সমান উচ্চতায় সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানোর পদ্ধতিকে কন্টুর পদ্ধতি বলা হয়। সেখানে ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে এবং সেচ দেওয়া অসুবিধাজনক সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত রোপন করা গাছের পারস্পরিক দূরত্ব কখনও সমান থাকে না।

১১। চারা রোপনের জন্য উপযুক্ত সময়: বৃক্ষজাতীয় ফলগাছের চারা রোপনের সবচেয়ে উত্তম সময় জুন-জুলাই মাস তবে জল সেচর সুবিধা থাকলে টবে বা পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা ও কলম এপ্রিল-মে মাসেও চারা রোপন করা যায়। শীতকাল বা খরার সময় গাছ লাগালে এর প্রতি অধিক যত্নশীল হতে হবে। নতুবা রোপিত চারা ও কলমের মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কলা গাছের বেলায় মার্চ-জুন মাস বেশ ভাল সময়।চারা রোপন করতে হলে বিকেল বেলায় করা উচিত। রোপনের পরপর জল সেচ দিয়ে গর্তের মাটি ভিজিযে দিতে হবে। এরপর পরবর্তী সপ্তাহ-কাল ধরে প্রতিদিন প্রয়োজন অনুসারে চারার গোড়ায় জল সেচ দিতে হবে।

১২। রোপণ দূরত্ব: জাতভেদে একই প্রজাতির ফল গাছ রোপণ দূরত্ব ভিন্ন হতে পারে। নিম্নের সারণীতে কয়েকটি জাতের ফল গাছের

রোপণের দূরত্ব উল্লেখ করা হলো-

গাছের নাম	রোপণ দূরত্ব	গাছের নাম	রোপণ দূরত্ব
আম	১০ মি.x ১০ মি.	মাল্টা	৪ মি. x ৪ মি.
লিচু	৮ মি.x ৮ মি.	মিষ্টি আমড়া	৪ মি.x ৪ মি.
কুল	৫ মি.x ৫ মি.	আমড়া	৭ মি. x ৭ মি.
পেয়ারা	৫ মি.x ৫ মি.	কাঁঠাল	১০ মি. x ১০ মি.
নারিকেল	৬ মি.x ৬ মি.	সফেদা	৭ মি.x ৭ মি.
কমলা	৩ মি. x ৩ মি.	জামরুল	৫ মি.x ৫ মি.
কলা	২.৫ মি. x ২.৫ মি.	আঁশফল	৫ মি x ৫ মি.
লেবু	৩ মি. x ৩ মি.	তেঁতুল	১০ মি x ১০ মি.
আতা	৪ মি.x ৪ মি.	জলপাই	৮ মি x ৮ মি.

১৩। গর্ত খনন

চারা রোপণের কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বে গর্ত চিহ্নিতকরণ খুঁটিকে কেন্দ্র করে গর্ত খনন করতে হবে। যাথে গর্তের উপরের ও নীচের অর্ধেকের মাটি তুলে গর্তের দুই পার্শে দুই ভাগ রেখে দিতে হবে, যাতে পরে উপরের মাটি গর্তের নিচের ভাগে এবং নীচের দিকের মাটি উপরিভাগে দেওয়া যায়। গর্তের মাটির সাথে সার মিশাতে হবে। বড় বৃক্ষের জন্য ১ মি.x ১ মি.x ১ মি., মাঝারি বৃক্ষের জন্য ৬০ সেমি.x ৬০ সেমি.x ৬০ সেমি. এবং ছোট বৃক্ষের জন্য ৪৫ সেমি.x ৪৫ সেমি.x ৪৫ সেমি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের ১০ দিন পূর্বে গর্তের মাটির সঙ্গে অনুমোদিত হারে জৈব ও অজৈব সার মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে জল সেচ দিতে হবে।

১৪। চারা রোপণ ও পরিচর্যা

গর্ত তৈরির ১০-১৫ দিন পর মাদার মাটি কুপিয়ে আলগা করে লে-আউট করার সময় দু'প্রান্তে পুঁতে রাখা খুঁটি বরাবর ফিতা ধরে ১ মিটার অভ্যন্তরে ১ম চারা এবং নির্ধারিত দূরত্বে অন্যান্য চারা লাগাতে হবে। চারা লাগানোর সময় খুব সাবধানে এর গোড়ার টব-পলিব্যাগ-খড় অপসারণ করতে হবে যাতে মাটির বলটি ভেঙে না যায়। চারা এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে এর গোড়া একদম সোজা থাকে এবং মাটির বলটি মাদার উপরের পৃষ্ঠ থেকে সামান্য নিচে থাকে। এর পর হাত দ্বারা আলতোভাবে মাটি চেপে দিতে হবে। চারাটি যাতে হেলে না যায় এবং এর গোড়া যাতে বাতাসে নড়াচড়া করতে না পারে সেই জন্য চারা লাগানোর পরপরই খুঁটি দিতে হবে। খুঁটিটি সোজা করে পুঁতে এর সঙ্গে শক্ত করে পাটের সুতলি বেঁধে চারাটি এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে চারা এবং খুঁটির মাঝে সামান্য দূরত্ব থাকে। গরু ছাগলের উপদ্রবের আশঙ্কা থাকলে, সম্পূর্ণ বাগানে অথবা প্রত্যেক গাছে বেড়া দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। লাগানোর পরপরই প্রতিটি চারায় জল সেচ দিতে হবে। চারা রোপণের পর এক সপ্তাহ প্রতিদিন এবং এর পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুসারে সেচ দিতে হবে।

১৫। গাছের মুকুল/ফল ভাঙন

কলমের গাছ রোপণের পরবর্তী বছর থেকেই মুকুল আসতে শুরু করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সীমিত হারে ফলও হয়। কিন্তু গাছের বয়স ২-৪ বছর না হওয়া পর্যন্ত মুকুল অথবা কচি ফল ভেঙে দিতে হবে। তবে জাত সম্পর্কে

নিশ্চিত হওয়ার জন্য দু'একটি ফল রাখা যেতে পারে।

১৬। ডাল ছাঁটাইকরণ

গাছ ছাটাইকরণ বৃক্ষজাতীয় গাছগুলোর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ঃ প্রথম কয়েক বছর এটা খেয়াল রাখা প্রয়োজন, কলমের গাছ রোপণের পর এর গোড়ার দিক অর্থাৎ আদিজোড় (Rootstock) থেকে নতুন ডাল বের হতে থাকে। এসব ডাল ভেঙে দিতে হবে। এছাড়া গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য গোড়ার দিকে বৃক্ষভেদে ০.৫-১.৫ মিটার কাণ্ড রেখে নিচের সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে, আম, পেয়ারা, লেবু, কাঁঠাল, বাতাবীলেবু ইত্যাদি গাছের গোড়া বা তার উপর থেকে একাধিক কাণ্ড ছাটাই করে দিলে, পরবর্তীকালে প্রতিটি গাছ বেড়ে উঠবে, সুন্দর একটি ছাতার মত আকৃতি নেবে। অনেক সময় বীজের চারায় ডালপালা না হয়ে প্রধান কাণ্ড ওপরের দিকে বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত উচ্চতায় গাছের ডগা কেটে দিতে হবে। প্রতি বছর বর্ষার সময় মরা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা ছাঁটাই করা ভালো। এছাড়া গাছ বেশি ঝোপালো হলে অতিরিক্ত ডালপালা ছাঁটাই করে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭। আগাছা দমন

ফল বাগান সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বর্ষার শুরুতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং বর্ষার শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাসে বাগানে চাষ দিয়ে আগাছা দমন করা যায়। গাছের কাছাকাছি যেখানে চাষ দেয়া সম্ভব হয়না সেখানে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা দমন করতে হবে। এরপরও আগাছার উপদ্রব পরিলক্ষিত হলে বর্ষা মরশুমে হাসুয়া বা বুশ কাটার দ্বারা কেটে এবং শীত মরশুমে চাষ ও কোদাল দ্বারা পুনরায় আগাছা দমন করতে হবে।

১৮। সার প্রয়োগ

বাড়ন্ত গাছের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুই মাস অন্তর সমান কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। অনুমোদিত মাত্রায় গাছের গোড়া থেকে সামান্য দূরে সার ছিটিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। ফলন্ত গাছে সাধারণত বছরে দুইবার সার প্রয়োগ করতে হয়। বর্ষার শুরুতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দু'এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর মাটিতে রস এলে ১ম কিস্তি এবং বর্ষার শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাসে বৃষ্টির পরিমাণ কমে এলে ২য় কিস্তির সার প্রয়োগ করতে হয়। দুপুর বেলায় যে পর্যন্ত ছায়া পড়ে তার থেকে সামান্য ভেতরে নালা তৈরি করে নালায় সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। অথবা গাছের গোড়ার ১.০-১.৫ মিটার বাদ দিয়ে দুপুর বেলায় যে পর্যন্ত ছায়া পড়ে সেই এলাকায় সার ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। সারের অপচয় রোধ করার জন্য বর্ষা মরশুমে ডিবলিং পদ্ধতি অনুসরণ করা উত্তম। পেয়ারা, কুল, লেবু জাতীয় ফল প্রভৃতি গাছের নতুন ডালে ফুল ও ফল হয়। এসব ক্ষেত্রে শীতের শেষে মাঘ-ফাগুন মাসে আরও এক কিস্তি সার প্রয়োগ করা উত্তম।

১৯। জল সেচ ও নিষ্কাশন

শীত ও গ্রীষ্ম মরশুমে বিশেষ করে ফল ধারনের পর এবং ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় ২-৩টি সেচ প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্লাবন সেচ না দিয়ে রিং বা বেসিন পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে পানি সাশ্রয় হবে। বর্ষা মরশুমে দ্রুত জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। এই জন্য বর্ষার শুরুতেই জল নিষ্কাশন নালা তৈরি করতে হবে।

২০। রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন

ফল গাছ রোপনের পর বিভিন্ন ধরনের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এজন্য নিয়মিত বাগান পরিদর্শন এবং প্রতিটি গাছ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে রোগবালাই দমনের ব্যবস্থা নিলে বাণিজ্যিকভাবে বাগান স্থাপন লাভজনক হবে।

কঞ্চি কলম তৈরীর প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন, যে স্কুলে প্রশিক্ষণ হবে তার কাছাকাছি ১বছর বা তার কম বয়সী বাঁশ ঝাড় চিহ্নিতকরণ করে রাখা, হাতে কলমে প্রশিক্ষণের সময় বালির বেড কোথায় প্রস্তুত হবে সেই স্থান চিহ্নিতকরণ করে রাখতে হবে, হাত করাত, ইঁট, কোদাল, নার্সারীর পলিপ্যাকেট, জল দেবার ঝারি, জল, বালতি, ৩ প্রকার বালি ১ বালতি করে (মিহি, একটু মোটা দানা, সর্বাপেক্ষা মোটা দানা)।

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৩ ঘঃ ৩০ মিঃ

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১০ মিনিট
২)	"বাঁশ চাষের উপযোগীতা.ppt" একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রদর্শণ, আলোচনা ও প্রশ্নত্তোরপর্ব	১৫ মিনিট
৩)	আলোচনার মাধ্যমে ব্যখ্যাঃ কঞ্চি কলম পদ্ধতির মাধ্যমে বাঁশ চাষ কেন করা হবে	১০ মিনিট
৪)	"সহজে কঞ্চিকলমের নানা ধাপ.ppt" পাওয়ারপয়েন্ট-এর মাধ্যমে খুব সহজে কঞ্চি কলমের বিভিন্ন ধাপ প্রদর্শণ –	১৫ মিনিট
৫)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ বোর্ডে চিত্র অঙ্কন সহ কঞ্চি কলম পদ্ধতির বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিষয়ে বিবিধ আলোচনা (কঞ্চি সংগ্রহ, বালির বেড নির্মাণ, বেডে কঞ্চি কলম রোপণ, কলম স্থানান্তর ও রোপন, পরিচর্যা প্রভৃতি)	৪৫ মিনিট
৬)	ভিডিও দেখানো হবেঃ "কঞ্চি কলম- mp4"	৫ মিনিট
৭)	প্রশিক্ষার্থীদের সাথে "কঞ্চি কলম" এর ভিডিও সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
৮)	প্রশিক্ষার্থীদের "কঞ্চি কলম" এর হ্যাণ্ডবিল বিতরণ – ৫ মিনিট	
৯)	হাতে-কলমে কঞ্চি কলম তৈরীর আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিপর্বের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষার্থীদের নিয়ে হাতে কলমে কঞ্চি কলম প্রস্তুতির প্রতিটি ধাপের প্রশিক্ষণ দেবে – ১ ঘন্টা	১৫ মিনিট
১০)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ অন্তিম আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট

কঞ্চি কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ

বাঁশের পরিচয়, বিস্তার ও প্রজাতিঃ

১। ঘাস পরিবারের সদস্য

২। পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতি, ২৪ ঘন্টায় ১ থেকে ১.৫ ফুট এবং ২ থেকে ৩ মাসের মধ্যে প্রজাতি ভেদে ৩০ থেকে ১০০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়।

৩। গ্রীষ্ম ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ভালো জন্মায়।

৪। পৃথিবীর ৮০% বাঁশ পাওয়া যায় এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়

৫। প্রায় ১৫০০ – ১৭০০ প্রজাতির বাঁশ দেখা যায়।

বাঁশের প্রধান প্রধান কিছু ব্যবহারঃ

মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, আসবাবপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে বাঁশের ব্যবহার অপরিসীম।

১। ভূমিক্ষয় রোধে বাঁশ রোপন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

২। বাঁশের সদ্য গজানো অঙ্কুর (Young Bamboo Shoot) এ রয়েছে উচ্চমানের পুষ্টি ও ঔষধি গুণাগুণ।

৩। বাঁশের সদ্য গজানো অঙ্কুরকে (Young Bamboo Shoot) সাধারণত বলা হয় "সুস্বাস্থ্যের রাজা খাদ্য" এবং "ক্ষুদ্রান্ত ও বৃহদান্ত্রের রাস্তা পরিস্কারক খাদ্য" কারণ ইহা খাদ্যদ্রব্য হজম করাতে, পাকস্থলী ও অন্ত্র পরিস্কার রাখতে, চর্বি কমাতে, গলস্টোন নিরাময়ে, কোলন ক্যান্সার, হেমারয়েড, ফিলিবাইটিস প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪। বাঁশের তৈরী কাগজ অত্যন্ত ভালো।

৫। বাঁশের তৈরী আসবাবপত্র ও সৌখিন জিনিষ বর্তমানে বহুল প্রচলিত।

৬। বর্তমানে বাঁশ "গরীবের কাঠ" হিসাবে পরিচিত।

৭। বাঁশ উৎপাদন করলে জঙ্গলের কাঠের উপর গুরুত্ব কমবে।

৮। বাঁশ শোধন করলে বাঁশের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হবে।

৯। বর্তমানে বাঁশ "গরীবের কাঠ" হিসাবে পরিচিত।

খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত
Young Bamboo Shoot

খাদ্য হিসাবে বাজারে বিক্রি হচ্ছে
Young Bamboo Shoot

বাঁশের তৈরী আসবাবপত্রঃ

বাঁশ চাষের সমস্যাঃ

বাঁশ চাষের প্রধান অন্তরায় হল বাঁশের চারা উৎপাদন কারণ বাঁশে সচরাচর ফুল এবং বীজ পাওয়া যায় না। বাঁশের ফুল আসতে প্রজাতিভেদে ২৫ – ৬০ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায় আবার ফুল আসলেও সকল বাঁশে বীজ হয় না। প্রচলিত মুথা পদ্ধতিতে মুথার দুষ্প্রাপ্যতা, উৎপাদন ও পরিবহন খরচ অনেক বেশী।

বাঁশের বংশবিস্তারের বিভিন্ন পদ্ধতি

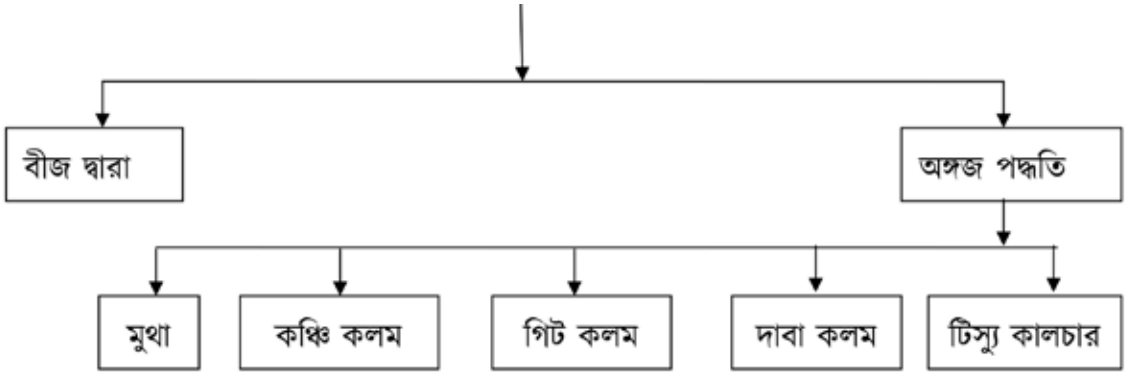

বাঁশ চাষের বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

মুথা পদ্ধতিঃ

১। অধিক সংখ্যক মুথা পাওয়া যায় না

২। চারা উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশী

৩। মাঠ পর্যায়ে উৎপাদন হার অনেক কম

৪। ৩-৪ বছরের মধ্যে ঝাড় হয়

টিস্যু কালচারঃ

১। কঞ্চির চোখ সহ গিট থেকে চারা উৎপাদন করা যায়

২। ১ টি চারা থেকে কম সময়ে প্রচুর সংখ্যক চারা পাওয়া যায়

৩। ঋতুর প্রভাব ছাড়া সারা বছর চারা উৎপাদন করা যায়

৪। ৩-৪ বছরের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বাঁশঝাড় তৈরী হয়

৫। মাঠ পর্যায়ে অন্য যে কোন চারার চেয়ে প্রতি বছর ৩-৪ গুণ বেশী নতুন বাঁশ পাওয়া যায়।

৬। এই পদ্ধতিতে চারা তৈরীর জন্য পরীক্ষাগার প্রয়োজন

কঞ্চি কলমঃ

বাঁশে প্রশাখা বিশেষ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে ও রোপন করে বাঁশের চারা উৎপাদন করাকে কঞ্চি কলম বলে

১। বাঁশের কঞ্চি থেকে চারা করা হয়

২। স্থানীয় ভাবে গ্রামীণ পদ্ধতিতে খুব সহজেই কঞ্চিকলম করা যায়।

৩। বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাস উপযুক্ত সময়, তবে শীতকাল ছাড়া অন্য সময় কঞ্চিকলম কম বেশী করা যায়।

৪। চারা উৎপাদন ব্যয় বহুলাংশে কম

৫। পরিবহন খরচ অনেক কম

৬। মূল বাঁশ নষ্ট করতে হয় না

৭। ৫-৬ বছরের ভিতর পূর্ণাঙ্গ বাঁশ ঝাড় তৈরী হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

১। বালির বেড (২০ফুট লম্বা ও ৪ ফুট চওড়া বা জমি অনুসারে যে কোন সাইজ)

২। কঞ্চি কাটার জন্য একটি হাত করাত

৩। কঞ্চি সাইজ করার জন্য একটি কাঁচি

৪। একটি প্লাষ্টিকের বালতি ও জল

প্রোপাগেশন বেড তৈরী

বালির বেডঃ

(১) সমতল জমির ওপর

(২) পাকা মেঝের ওপর

(৩) মাটির ওপর

বালির স্তরঃ

তিনটি স্তরে তিন প্রকার বালি ব্যবহৃত হবে

উপর স্তরঃ মিহি দানার বালি ; মধ্য স্তরঃ মাঝারি দানার বালি ; নীচের স্তরঃ মোটা কাঁকর বালি বালির প্রতিটি

স্তর ৭- সেমি পুরু হবে তাতে নার্সারী বেডটি মোট ২১ – ৩০ সেমি বা ৯ – ১২ ইঞ্চি পুরু হয়ে যাবে এবং সব ধরণের বালি সব রকমের আবর্জনা থেকে মুক্ত হবে।

বালির বেডের ধার/কিনার বাঁধার জন্য চারিদিকটা বা ইট/বাঁশের দরমা ব্যবহার করুন অথবা সমতল মাটিতে বেডের আকৃতিতে মাটি কেটে আয়তকার ব্লক তৈরি করুন।

মাটিতে কাটা ব্লকটি ত্রিস্তরে বালি দিয়ে ভরে দিন। এটি একটি বেড হয়ে গেল।

প্রোপাগেশন বেড

কঞ্চি কলম সংগ্রহঃ

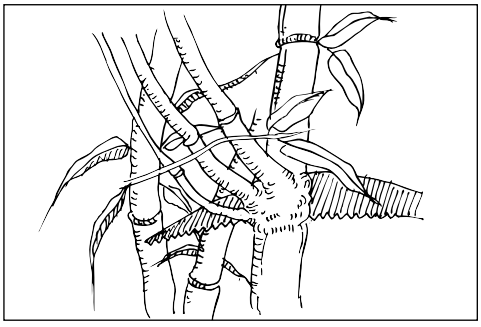

• কলম কাটার জন্য সুস্থ, সবল, অপেক্ষাকৃত মোটা আকৃতির এক বছরের কম বয়সের বাঁশ নির্বাচন করুন।
• বাঁশের গা ঘেঁষে আঙ্গুলের মত মোটা কঞ্চি হাত করাত দিয়ে কঞ্চি ও বাঁশের সংযোগস্থলের নিচ থেকে সামান্য করে কেটে দিন এবং উপরের দিক থেকে বাঁশের গা ঘেষে কেটে কঞ্চি সংগ্রহ করুন।
• কঞ্চির গোড়া থেকে ৩-৫ গিট বা দেড় হাত লম্বা করে কঞ্চি কলমের জন্য কাটুন।
• সংগৃহীত কঞ্চিগুলি নার্সারির বেডে লাগানোর পূর্ব পর্যন্ত ভেজা চট দিয়ে মুড়িয়ে রাখুন অথবা জলে ভিজিয়ে রাখুন তবে কঞ্চির গোড়াগুলি ৩ – ৪ ইঞ্চি জলে যেন ডুবে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
• কার্তিক থেকে মাঘ (অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি) মাস বাদে সারা বছরই কঞ্চি কলম করা যায়। ফাল্গুন হতে আশ্বিন (ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর) মাস কঞ্চি কলম কাটার উপযুক্ত সময়।

- কঞ্চিকলম সংগ্রহের জন্য "বৈশাখ – জৈষ্ঠ্য" মাস সবচেয়ে ভালো সময়
- বাঁশের বয়স চেনার উপায়

১ বছরের কম

বাঁশের অধিকাংশ গিটে খোলস থাকবে, গিটে কঞ্চি গজাবে, বাঁশ গাঢ় সবুজ রঙ হবে

১বছর থেকে বেশী – ২বছর থেকে কম বয়সঃ

বাঁশের কিছু গিটে তখনো খোলস থাকবে, প্রায় প্রতি গিটেই কঞ্চি গজায় এবং কঞ্চিতে পাতা বার হয়।

২ বছর থেকে বেশী – ৩বছর থেকে কম বয়স

বাঁশের গোড়ার দিক হতে প্রায় সব গিটের খোলস ঝরে যায়, কঞ্চিগুলো শক্ত হয় এবং বাঁশের রঙ কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

৩ বছরের ঊর্ধে

বাঁশ সবুজ বর্ণ থেকে পরিবর্তিত হয়ে কিছুটা হলুদ বর্ণ গাড়ো সবুজ ধারণ করে এবং বাঁশের রঙ অনেকটা বাদামী মরিচা রঙ হয়ে যায়।

বেডে কঞ্চি কলম রোপণঃ

- বালির বেডে কঞ্চিগুলি ২-৩ সেমি দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে ৭-১০ সেমি গভীরে ভালভাবে বালি চেপে লাগান।
- বেডে কঞ্চি রোপণের পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত দিনে ২-৩ বার ঝরনা দিয়ে জল সেচ দিন। শেষের ১৫ দিন দৈনিক ২ বার (সকালে ও বিকালে) জলসেচ দিলেই চলবে।
- এ সময়ের মধ্যেই কঞ্চিতে নতুন শাখা-প্রশাখা ও পাতা গজিয়ে সম্পূর্ণ বেড সবুজ আকার ধারণ করবে এবং কঞ্চি-কলমের গোড়ায় পর্যাপ্ত শিকড় গজাবে। তখন বেডে ধীরে ধীরে জল সেচের পরিমাণ কমিয়ে দিন।

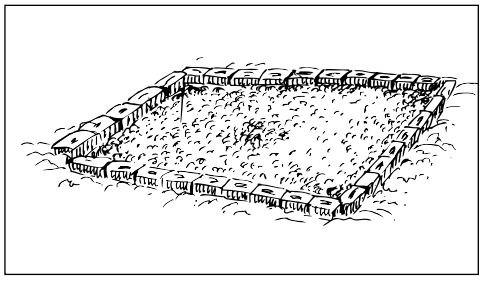

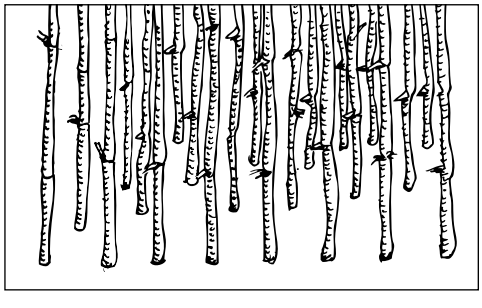

কলম স্থানান্তর ও রোপণঃ

- শিকড়যুক্ত কলম পলিথিন ব্যাগ বা উপযুক্ত পাত্রে স্থানান্তর করুন। স্থানান্তর করার জন্য ৩:১ অনুপাতে মাটিঃগোবর মিশ্রন ব্যবহার করুন।
- প্রতিটি ব্যাগে বা পাত্রে একটি করে শিকড় গজানো কঞ্চি কলম স্থানান্তর করুন। বালির বেড থেকে শিকড় সহ কলম তুলে নিয়ে কোন গামলা বা বালতির জলে ধীরে ধীরে নাড়াচাড়া করতে হবে এবং ভালো করে ধুয়ে নিয়ে হবে যাতে কলমের গোড়ার বালি ধুয়ে চলে যাবে। আষাঢ় – শ্রাবণ মাসে বালির বেড থেকে চারা সাধারণত পলি প্যাকেটে রোপণ করতে হবে। প্যাকেটের মাপ সাধারণত

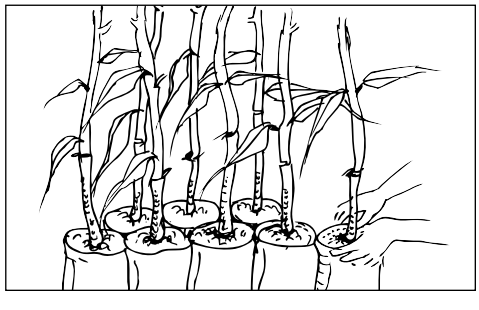

৬ – ৮ ইঞ্চি হওয়া উচিত।

• ৭-১০ দিন কলমটি ছায়ায় রাখুন। এই সময় নিয়মিত দিনে একবার জল দিন। নার্সারীর জন্য প্রস্তুত শেডনেটেও এই কাজ করা যেতে পারে।

• এখন কলমগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা ও "হার্ডেনিং" বা "পোক্ত করার জন্য" কলম সমেত পলি ব্যাগগুলি সারিবদ্ধ ভাবে রোদে সাজিয়ে রাখুন। মাঠে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত ব্যাগের আগাছা বাছাই করুন ও পরিমিত জল দিন। সময়টা হবে মোটামুটি জৈষ্ঠ - আষাঢ় মাসের শেষভাগে।

শিকড়সহ কলম

পলিথিন ব্যাগে কঞ্চি কলম

• জৈষ্ঠ – আষাঢ় মাস পর্যন্ত কলম বা চারা রোপণের উপযুক্ত সময়, বর্ষা দীর্ঘস্থায়ী হলে কেবল ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে চারা রোপণ করা উচিত হবে নতুবা অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী রোপণ মরশুমের জন্য। এক্ষেত্রে প্রায় ৮ মাস চারাগুলিকে নার্সারীতে রেখে তাদের যত্ন নিতে হবে। জল সেচ দেওয়া ও আগাছা পরিস্কার করাই হবে প্রধান কাজ।

• চার বছরে একটি কঞ্চিকলম ঝাড়ে পরিণত হয়। ছয় বছর হলে আপনি ঝাড় থেকে বাঁশ আহরণ করতে পারবেন।

বাঁশ চাষের জমি নির্বাচনঃ

• সাধারণত ডোবা, খাল, নালা, পুকুরের পাড়ে এবং বাড়ীর আশে-পাশের প্রান্তিক জমিতে বাঁশ চাষ করা হয়।

• যেসব জায়গায় নতুন মাটি ফেলা হয়, সেখানে জমির কিনারার দিকে বাঁশ লাগিয়ে ভূমিক্ষয়রোধ করা একটি উত্তম ব্যবস্থা।

• কখনো কোন গাছের নীচে বা ঘন ছায়াতে বাঁশ গাছ লাগানো উচিত নয়।

• লবণাক্ত জমিতে বাঁশ গাছ হয় না।

• জমির উচ্চতা ও ঢাল এমন হওয়া দরকার যাতে বৃষ্টির জল সহজেই গড়িয়ে চলে যায় এবং কখনই জলাবদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি না হয়।

• পাহাড়ী এলাকার বাসগৃহের আশেপাশে চৌহদ্দির ঢালু স্থানে প্রান্তিক রেখা বরাবর লাইন করে বাঁশ লাগালে তা থেকে সেখানে কালক্রমে একটি দীর্ঘস্থায়ী বেড়ার সৃষ্টি হবে এবং তা ভূমিক্ষয়ও রোধ করবে।

• বনাঞ্চলের পাহাড়ী জমির নীচের ঢালে বাঁশ চাষ করা উত্তম।

• নির্বাচিত স্থানে ৫ মিটার বা প্রায় ১৬ ফুট দূরে দূরে বর্গ প্রণালীতে রোপনের স্থানগুলো নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

• নির্বাচিত স্থানে গর্ত খোড়াই হচ্ছে পরবর্তী কাজ, কঞ্চিকলম ও বীজজাত চারার বেলায় গর্তের গভীরতা হবে মোটামুটি ১.২৫ ফুট ও ব্যাস ১ ফুট।

গর্তে সার প্রয়োগঃ

গর্ত করার পর প্রতি গর্তে প্রায় ৫ কেজি পরিমাণ গোবর সার, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টি. এস. পি এবং ৫ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ মিশিয়ে সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে ভর্তি করতে হবে।

কঞ্চিকলম বা চারা রোপণঃ

• প্রায় ২ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্তগুলোকে ঐভাবে রেখে দিয়ে তারপর কঞ্চিকলম বা চারা রোপণ করতে হবে।

• কঞ্চিকলম বা চারা রোপণ করতে হবে সোজাসুজি বা খাড়াভাবে

• বাঁশ লাগানোর পর খরা থাকলে প্রতি চারার গোড়ায় সপ্তাহে অন্তত ২ দিন এক কলসী করে জল সেচ দেওয়া দরকার।

বাঁশ চাষে বিভিন্ন প্রকার পরিচর্যাঃ

প্রতি বছর ফাল্গুন – চৈত্র মাসে ঝাড়ের তলার মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হবে তবে সার হিসাবে ধানের চিটে, আখের ছিবড়ে ব্যবহার করা ভালো। ঝাড়ের চারদিকে মাটিতে ১১/২ ফুট চওড়া ও ২ ফুট গভীর করে নালা কেটে সেই নালায় সার প্রয়োগের পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে বা ঝাড়ের চারিদিকে মাটি কুপিয়ে সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পর বৃষ্টি না হলে বাঁশ ঝাড়ে জল দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

জল সেচ ও মালচিঃ

• বাঁশঝাড়ের প্রথম অবস্থায় চারাগাছে জল সেচ দেওয়া বিশেষ দরকার।

• সাধারণত কার্তিক থেকে চৈত্র পর্যন্ত সময়ে জল সেচের ব্যবস্থা দরকার হয়।

• প্রথম বছর ১ সপ্তাহ পর পর গাছ প্রতি এক বালতি জল দিতে হবে, পরের বছরগুলিতে জলের পরিমাণ এক বালতি করে বাড়িয়ে ৫ বছর ধরে পাঁচ বালতি জল দিতে হবে।

• চারার গোড়ায় কচুরীপানা বা খড় দিয়ে ঢকে দিলে ঝাড়ের তলার মাটি সহজে শুকাবে না এবং তখন সেচের জলের প্রয়োজনও হবে অনেক কম।

আগাছা পরিষ্করণঃ

• চারা রোপণের পর প্রথম ৩-৪ বছর ঝাড়ের গোড়া থেকে আগাছা পরিস্কার করা দরকার।

• আগাছাপূর্ণ স্থানে নতুন বাঁশ সহজে গজাতে পারে না, গজালেও তা দূর্বল হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ঝাড়ের পরিপূর্ণতা বৃদ্ধি হতে অনেক বেশি সময় লেগে যায়।

• বাঁশ ঝাড় সম্পূর্ণভাবে আগাছাবিহীন রাখলে ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যেই বাঁশ ঝাড় থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাঁশ আহরণ শুরু করে দেওয়া যেতে পারে।

• চারার সারির ফাঁকে ফাঁকে অড়হড়, মাদার ইত্যাদি গাছ লাগানো যেতে পারে তাতে একদিকে যেমন আগাছা বাছাইয়ের খরচও কিছুটা কমবে আবার ঐ সব ফসল বা গাছ উৎপন্ন করে কিছু কিছু আয় করাও সম্ভব হবে।

বাঁশ পাতলাকরণঃ

কঞ্চি বা বীজজাত চারা দিয়ে বাঁশ রোপণের পর প্রথম ১ – ২ বছর সেখানে চিকন ও সরস বাঁশ জন্মায়, এই চিকন বাঁশ কেটে ফেলা উচিত। বাঁশ কাটার সময় তা একেবারে মাটির গা ঘেসে কাটা উচিত। বাঁশ ঝাড়ে বাতাস চলাচল ও আলো প্রবেশ করলে তা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং এমন পরিবেশ প্রচুর সংখ্যায় বাঁশ গজাতে ও স্বাস্থ্যবান বাঁশ ঝাড় সৃষ্টিতে সাহায্য করবে।

রোগ ও পোকামাকড় দমনঃ

রোগের মধ্যে বাঁশের মাথাপচা রোগ প্রধান, এতে প্রধানত বাঁশের মাথা পচে বা ভেঙ্গে পড়ে। ইহা দমনের জন্য ২ টি ব্যবস্থা নেওয়া যায় (ক) মরা বাঁশ দেখা মাত্র তা ঝাড় থেকে অপসারণ করে পুড়িয়ে দিতে হবে বা জীবাণুনাশক ওষুধ ডায়থেন এম-৪৫ ব্যবহার করা যেতে পারে। পোকার মধ্যে উঁই পোকার আক্রমণ সর্বপ্রধান। ইহা দমনের জন্য উই এর দ্বারা উঠানো মাটি কোদাল, দা বা অন্য সুবিধা মত যন্ত্র দিয়ে কাঁচিয়ে ফেলতে হবে। পরে ঐ মাটিসহ পোকাগুলোর উপর ওষুধ ছড়াতে হবে।

বাঁশ চাষ জন্য সহযোগীতার প্রয়োজনীয় কেন্দ্রঃ

১। বনবিভাগ

২। জাতীয় ব্যাম্বু মিশন

৩। কৃষি বিভাগ

৪। পেপার প্রস্তুতকারক সংস্থা

চার বছরে একটি কঞ্চিকলম ঝাড়ে পরিণত হয়।

ছয় বছর হলে আপনি ঝাড় থেকে বাঁশ আহরন করতে পারবেন।

আফটার স্কুলে কলমের মাধ্যমে চারা তৈরীর প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন, কলম তৈরী দেখানোর জন্য লেবু, পেয়ারা ও লিচু গাছের কয়েকটি উপযুক্ত ডাল, ধারালো চাকু, স্বচ্ছ প্লাষ্টিক, কিছু সুতো, অল্প পরিমাণ মাটি ও গোবরের মিশ্রণ, নার্সারীর পলি প্যাকেট

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৪ ঘন্টা

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	প্রশিক্ষার্থীদের সাথে পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১০ মিনিট
২)	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব	(বুকলেট অনুসারে)
ক]	কলম পদ্ধতি কি, কলম পদ্ধতির উপযোগীতা এবং সুবিধা ও অসুবিধা	২০ মিনিট
খ]	সংক্ষেপে বিভিন্ন প্রকার কলম পদ্ধতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা (বোর্ডে ছবি অঙ্কন সহ)	৩০ মিনিট
গ]	কলম তৈরীর জন্য ডাল নির্বাচন ও প্রস্তুতিকরণ – এর ব্যাখ্যা এবং হাতে কলমে দেখানো	১০ মিনিট
৩)	ভিডিও দেখানো হবেঃ "পেয়ারা গাছের কলম পদ্ধতি- mp4	৫ মিনিট
৪)	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বঃ কলমে শিকড় বার হবার পর থেকে চারা তৈরীর প্রক্রিয়াকরণ	২৫ মিনিট
৫)	ভিডিও দেখানো হবেঃ "লেবু গাছের কলম পদ্ধতি.mp4" [কলম বাঁধা থেকে ফুল আসা পর্যন্ত]	১০ মিনিট
৬)	দেখানো ভিডিওটি নিয়ে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	১০ মিনিট
৭)	ভিডিও দেখানো হবেঃ "পার্শ্ব কলম- mp4	৫ মিনিট
৮)	"পার্শ্ব জোড়" কলম পদ্ধতির উপযোগীতা এবং প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বুকলেট অনুসারে)	১৫ মিনিট
৯)	হাতে কলমে প্রত্যেক প্রশিক্ষার্থী পরীক্ষামুলক ভাবে কলম তৈরীর জন্য ডাল প্রস্তুত করবে এবং প্রশিক্ষকের উপস্থিতিতে পরীক্ষামূলক ভাবে ঐ ডালে কলম বাঁধবে	১ ঘণ্টা ২০ মিনিট
১০)	প্রশিক্ষার্থীদের সাথে "কলমের মাধ্যমে চারা তৈরীর" উপর শেষ পর্বের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
১১)	প্রত্যেক প্রশিক্ষার্থীকে "কলমের মাধ্যমে চারা তৈরীর" – ওপর বুকলেট বিতরণ করা হবে	৫ মিনিট

বিভিন্ন প্রকার কলম পদ্ধতি মাধ্যমে গাছের বংশবৃদ্ধি

সাধারণ ভাবে একটি গাছ থেকে আরেকটি গাছের জন্ম হওয়ার পদ্ধতিকে গাছের বংশ বিস্তার বলে। বংশ বিস্তার দুই প্রকার যথাঃ ১। যৌন বংশ বিস্তার ও ২। অযৌন বংশ বিস্তার। কাটিং হল অযৌন বংশবিস্তারের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। গাছের বিভিন্ন অংগ, যেমন - কান্ড, শিকড়, পাতা, পত্রকুড়ি প্রভৃতি মাতৃগাছ থেকে আলাদা করে রাসায়নিক, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে শিকড় গজানোর মাধ্যমে মাতৃগাছের অনুরুপ নতুন গাছ উৎপাদনকে কাটিং বলে। কোন ভালো জাতের আম, লিচু, পেয়ারা, লেবু, আপেল, কমলা প্রভৃতি গাছ থেকে সঠিক মানের চারা পেতে হলে বীজের ওপর নির্ভর করলে চলবে না কারণ বীজ প্রধানত বিভিন্ন জাতের মধ্যে পরাগসংযোগ ঘটিয়ে থাকে। তাই গাছের মূল, কাণ্ড ও পাতা দিয়ে গাছের বংশ বৃদ্ধি পেলে তাতে পূর্বপুরুষের গুণগত মান বজায় থাকে। তাছাড়া গাছ লাগানোর খুব অল্পদিনের মধ্যে গাছে ফুল ও ফল আসে। ফল গাছ রোপনের মূল উদ্দেশ্য হলো ভাল, উন্নতমান ও মাতৃগুন সম্পন্ন ফল পাওয়া। এ কারণে, ফল গাছ রোপনের ক্ষেত্রে যৌন পদ্ধতির তুলনায় অযৌন পদ্ধতির চারা/কলম গুরুত্বপূর্ন। কারন এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত চারা/কলম রোপন করলে মাতৃগুনাগুন সম্পন্ন ফল পাওয়া যায়, গাছে তাড়াতাড়ি ফল ধরে এবং গাছ ছোট হয় বিধায় অল্প পরিসরে অনেক গাছ রোপন করা যায়। কলম করার উপযুক্ত সময় মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত কলম করার উপযুক্ত সময়। কারন এ সময় বাতাসে আদ্রতা ও গাছের কোষের কার্যকারিতা বেশী থাকে। ফলে তাড়াতাড়ি জোড়া লাগে এবং সফলতার হারও বেশী পাওয়া যায়।

কাটিং এর সুবিধাঃ

১. অংগজ বংশবিস্তার পদ্ধতি সমূহের মধ্যে এ পদ্ধতিতে সবচেয়ে সহজে ও কম খরচে অধিক চারা উৎপাদন করা যায়।, ২. জোড় কলমের মত এতে কোন জোড় অসামঞ্জস্যতা হয় না।, ৩. এ পদ্ধতিতে অল্প জায়গায় অনেক চারা উৎপাদন করা যায়।

৪. এতে তেমন খুব একটা কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।, ৫. মাতৃগাছের গুণাগুণ অক্ষুন্ন রেখে নতুন চারা দ্রুত উৎপন্ন করা যায়।, ৬. একটি মাত্র গাছ থেকে অসংখ্য গাছ জন্মানো সম্ভব হয়।, ৭. বসত বাড়ীতে হেজ বা বেড়া নির্মাণে ও ফল গাছের বংশবিস্তারে এটি একটি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি।

কাটিং এর অসুবিধাঃ

১. উপযুক্ত পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক সময় কর্তিত অংশের মূল গজায় না।, ২. অনেক সময় কাটিং মাটি বাহিত বিভিন্ন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।, ৩. কোন কোন সময় শিকড় গজানোর পর মাটির প্রতিকূল অবস্থার কারণে শিকড় নষ্ট হয়ে যায়।, ৪. কাটিং থেকে জন্মানো ফল গাছ অতি সহজেই ঝড় বাতাসে উপড়ে যেতে পারে। কারণ এতে কোন প্রধান মূল তৈরী হয় না।, ৫. সব গাছে কাটিং সফল হয় না বা কোন কোন ফল গাছে এর সফলতার হার এত কম যে সেক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুমোদন করা যায় না। যেমন- বীজবিহীন এবং এলাচি লেবুতে কাটিং এর সফলতার হার অনেক বেশি অথচ কাগজি লেবুতে কাটিং সফল হয় না।

কাটিং এর প্রকারভেদঃ

ক] শিকড় কাটিং ঃ পরিণত গাছের শিকড় বা শিকড়াংশ মাতৃগাছ থেকে আলাদা করে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় চারা উৎপাদন পদ্ধতিকে শিকড় কাটিং বলে। এই পদ্ধতিতে ১৫-২০ সেঃ মিঃ লম্বা এবং পেন্সিল বা আঙ্গুলের মতন মোটা শিকড়ের অংশ তির্যকভাবে কেটে মাটিতে পুতে রাখতে হয়।

এ কলম করার ক্ষেত্রে মাটিতে পরিমিত আদ্রতা নিশ্চিত করতে হবে। কিছুদিন পর কাটিং থেকে শিকড়সহ নতুন শাখা বের হয় এবং নতুন গাছের জন্ম দিবে। এই পদ্ধতিতে পেয়ারা, বেল, ডালিম, লেবু, বাগান বিলাস, এলামন্ডা ইত্যাদি ফল ও ফুলের চারা উৎপাদন করা যায়। এই পদ্ধতিতে গাছের বংশবিস্তার আমাদের দেশে বর্ষাকালে করা হয়। গাছ নতুন ভাবে যখন ডালপালা ছাড়া শুরু করে তার পূর্বেই এই শিকড় সংগ্রহ করতে হয়। কারণ এই সময় শিকড়ে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য মজুদ থাকে। এতে কাটিং এ সফলতার হার বেড়ে যায়।

খ] ডাল কাটিং বা শাখা কলমঃ গাছের ডাল থেকে যে কাটিং করা হয় তাকে শাখা কলম বলা হয়। ভাল কলম পাওয়ার জন্য এই ধরণের কলমকে গাছের ডালের প্রকারের ওপর ভিত্তি করে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়।

ক) কচি শাখা কলম - আপেল, নাশপাতি, রঙ্গন, ডুরান্ডা ইত্যাদি গাছের জন্য কচি ডাল ব্যবহার করা হয়। এ সকল গাছের ক্ষেত্রে আধা শক্ত ডাল চারা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কচি ডালের ন্যায় ভাল হয় না।

খ) কোমল শাখা কলম - চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গাঁদা, মিষ্টি আলু ইত্যাদি গাছের ক্ষেত্রে ডালের মাথার দিকের কোমল ডাল বা নতুন গজানো ডগা কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এ সকল গাছের ক্ষেত্রে কচি বা আধাশক্ত ডাল চারা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যায়। তবে তা কোমল ডালের ন্যায় ভালো চারা উৎপাদিত হবে না।

গ) আধা শক্ত শাখা কলম - লেবু, আঙ্গুর, গোলাপ ইত্যাদি। এ সকর ডাল পেন্সিলের ন্যায় চিকন অথবা সামান্য মোটা হতে পারে। শক্ত ডাল বা কচি ডাল দিয়েও এ সকল গাছের চারা উৎপাদন করা যায় তবে সে সকল চারা আধাশক্ত ডালের ন্যায় ভাল হয় না।

ঘ) শক্ত ডালের কলম - জলপাই, ডালিম, জামরুল, পাতাবাহার, জবা, গন্ধরাজ, মুসান্ডা ইত্যাদি গাছের ক্ষেত্রে ৬-১২ মাস বয়সের আঙ্গুল অথবা পেন্সিলের ন্যায় মোটা ডাল নির্বাচন করা হয়। এ সব গাছের ক্ষেত্রে আধা শক্ত ডাল ব্যবহার করেও চারা উৎপাদন করা যায় তবে তা শক্ত ডালের ন্যায় ভালো চারা উৎপাদিত হয় না।

২) দাবা কলমঃ যখন ডালগুলোকে গাছ থেকে পৃথক না করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ডালের ছাল তুলে মাটি ও গোবর মিশ্রণ ঢাকা দিয়ে গাছ তৈরী করা হয়, তখন সেই পদ্ধতিকে দাবা কলম বলা হয়। দাবা কলমের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে।

ক) সাধারণ দাবা কলম – লেবু, পেয়ারা, জুঁই প্রভৃতি

খ) বক্রগতি দাবা কলম – চামেলি, আঙ্গুর প্রভৃতি

গ) নালায় দাবা কলম – ন্যাসপাতি, চেরি, আপেল প্রভৃতি

ঘ) ডগায় দাবা কলম – ব্ল্যাকবেরী, র্যা স্পবেরী প্রভৃতি

ঙ) গুটি কলম – লেবু, পেয়ারা, লিচু, ডালিম, বাতাবী লেবু, প্রভৃতি

৩) জোড় কলমঃ যে সব পদ্ধতি দ্বারা একটি বুনো জাতের উপর একটি ভালো জাতের গাছের ডাল বা ডালের টুকরো জোড় দেওয়া হয় তাকে জোড় কলম বলা হয়। জোড় কলম আবার অনেকভাবে করা হয়ে থাকে। যেমন –

ক) সাধারণ জোড় কলম – আম, পেয়ারা, সফেদা

খ) পার্শ্ব জোড় কলম – আম

গ) আঁটি জোড় কলম – আম, কাজু বাদাম

ঘ) কীলক জোড় কলম – আম, আঙ্গুর, বাদাম

ঙ) জিহ্বা জোড়কলম – আপেল, ন্যাসপাতি

৪) মুকুল কলমঃ এই পদ্ধতিতে একটি বুনো জাতের গাছের উপর একটি ভালো জাতের গাছের পার্শ্বমুকুল তুলে এনে জোড় দেওয়া হয়। এই জোড় মুকুল বেড়ে ভালো জাতের নতুন গাছ তৈরী করে।

রুট হরমোন: নরম কাটিং এ শিকড় আসার আগে কাটা অংশে পেরিসাইকেল তন্তু বাড়তে থাকে। বলা বাহুল্য কোষ বিভাজনের মাধ্যমে তন্তুর বৃদ্ধি ঘটে। তখন কাটিং অনেকখানি সতেজ হয়ে ওঠে এবং এটি হল শিকড় আসার আগের অবস্থা। কাটিং – এ রুট হরমোন ব্যবহার করলে পেরিসাইকেল তাড়াতাড়ি বাড়তে শুরু করে।

শক্ত বা আধাশক্ত শাখা কাটিং এর জন্য ডাল নির্বাচনের শর্তাবলী

ক) কাটিং এর জন্য ডাল নির্বাচনের সময় অবশ্যই সুস্থ্য, সবল, ডাল নির্বাচন করতে হবে।

খ) নির্বাচিত ডালের পাতাগুলো ধারালো সিকেচার দিয়ে কেটে ফেলতে হবে।

গ) কাটিং এর জন্য ব্যবহৃত ডালে কমপক্ষে তিনটি গিট বা কুঁড়ি (Bud) থাকতে হবে।

ঘ) গাছের দক্ষিন ও পূর্ব দিকের ডালে কাটিং ভাল হয, সফলতার হার বেশী। কারণ দক্ষিন ও পূর্ব দিকের ডালে সূর্যের আলো বেশী পড়ে এবং মজুদ খাদ্যের পরিমান বেশী থাকে।

ঙ) কাটিং এর জন্য বৈশাখ হতে আষাঢ় মাস উত্তম তবে শীতকাল ছাড়া সারা বছরই ডাল কর্তন কলম করা যায়।

কাটিং এর জন্য ডাল তৈরীকরণ: কাটিং এর জন্য নির্বাচিত ডালটির উপরের অংশের কাটটি গিটের উপরে গোল করে এবং নিচের অংশের কাটটি গিটের নিচে তেছরা করে কাটতে হবে। এতে কাটিংটির আগা-গোড়া সহজেই চেনা যাবে এবং তেছরা কাটা অংশে বেশী পরিমাণ শিকড় গজানোর সুযোগ পায় । সাধারণত ৬-১২ মাস বয়সের ১৫-২০ সে: মি: লম্বা এবং পেন্সিল বা আঙ্গুলের মত মোটা ডালের অংশ কাটিং হিসেবে কর্তন করা হয়।

চারা তৈরীঃ

ক) কাটিং এর জন্য তৈরিকৃত ডালগুলো উঁচু বীজতলা, টব বা কাঠের ট্রেতে রোপন করা যাবে। বেলে-দোয়াঁশ মাটির সাথে প্রচুর পরিমান পচা গোবর মিশিয়ে বীজতলা তৈরী, টব বা কাঠের ট্রেতে ভর্তি করে কাটিং রোপন করতে হবে।

খ) বীজতলার দৈঘ্য ৩ মিটার ও প্রস্থ ১ মিটার হতে হবে এবং বেডটি উত্তর - দক্ষিন দিকে লম্বা লম্বি হবে।

গ) বীজতলায় ২০ সেমি: পর পর লাইন তৈরী করে প্রতি লাইনে ২০ সেমি: পর পর কাটিং লাগাতে হবে। কাটিং লাগানোর সময় গচি দিয়ে ছিদ্র করে কাটিং এর তেরছা অংশ মাটিতে বসাতে হবে।

ঘ) কাটিং ৪৫ কৌনিক ডিগ্রীতে উত্তর মুখী করে বেডে বসাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ১টি গিট সহ এক তৃতীয়াংশ মাটির ভিতরে প্রবেশ করে।

ঙ) কাটিং বসানোর পর কাটিং এর গোড়ার মাটি ভাল ভাবে চেপে দিতে হবে যেন ভিতরে ফাঁকা না থাকে।

চ) এবার পানি দিয়ে বেডটি ভাল ভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

ছ) হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে ও মাঝে মাঝে সেচ দিতে হবে।

জ) এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে কাটিং হতে কুঁড়ি ও শিকড় গজাবে। তিন মাসের মধ্যে গজানো কাটিং বেড হতে তুলে পটিং করা যাবে, রোপন বা বিক্রয় করা যাবে। কাটিং বেড হতে উঠানোর ৩-৪ ঘন্টা আগে বীজতলার মাটি পানি দিয়ে ভাল ভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতপরঃ নিড়ানীর সাহায্যে কাটিং এর গোড়া হতে ৩-৪ ইঞ্চি দুর দিয়ে মাটির বলসহ কাটিংটি উঠাতে হবে। সাথে সাথে পটে/পলিব্যাগে পটিং বা বাগানে রোপন করতে হবে। বিক্রয় করতে হলে কাটিং এর গোড়ার মাটির বলটি নলি সুতা দিয়ে পেঁচিয়ে হালকা ছায়া যুক্ত স্থানে ১০-১৫ দিন হার্ডেনিং করে বিক্রয় করতে হবে। হার্ডেনিং এর সময় গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী দিনে ১-২ বার হালকা সেচ দিতে হবে।

কাটিং এর উপরের কাটা অংশে ছত্রাক নাশক লাগালে রোদ ও রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নিচের কাটা অংশে হরমোন (আই,বি,এ = ইনডোল বিউটারিক এসিড, বাজারে বাণিজ্যিক নাম সুরাটেক্স) ব্যবহার করলে খুব সহজেই শিকড় গজায়।

গ] পাতা কাটিং ঃ কিছু কিছু গাছ আছে যেমনঃ পাথর কুচি, মিষ্টি আলু, লেবু, ফনিমনসা, ইত্যাদির পাতা কাটিং হিসাবে ব্যবহার করলে সহজে চারা উৎপাদন করা যায়। এ পদ্ধতিতে সম্পুর্ণ পাতা বা পাতার বিভিন্ন অংশ, যেমনঃ পত্রফলক, বোটাসহ পাতা প্রভৃতি মাতৃগাছ হতে আলাদা করে নতুন চারা উৎপাদনকে পাতা কাটিং কলম বলে। পাতার গোড়া বা অন্যান্য অংশ থেকে শিকড় ও পাতা বা কান্ড জন্মে নতুন চারা উৎপন্ন হয়। পত্র কলমের জন্য অধিক আদ্রতার দরকার হয়।

ঘ] পত্রকুঁড়ি কাটিং ঃ কিছু কিছু গাছ আছে যাদের পত্রকুঁড়ি কাটিং হিসাবে ব্যবহার করে সহজে চারা উৎপাদন করা যায়। এ পদ্ধতিতে পাতা, পাতার বোটা, ছোট একটুকরা কান্ড ও পত্রাক্ষে অবস্থিত একটি সুপ্ত কুঁড়ির সমন্বয়ে গঠিত হয় পত্রকুঁড়ি কলম। যেমন - চা, এলাচি লেবু ইত্যাদি। যেসব গাছের পাতা থেকে শিকড় বাহির হয় কিন্তু কান্ড বাহির হয় না এমন গাছের জন্য পত্রকুড়ির কাটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীতের শেষ দিকে সাধারণতঃ পত্রকুঁড়ি কলম করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে এক মৌসুমেই প্রতিটি কুঁড়ি হতে একটি নতুন চারা উৎপাদন করা যায়।

লেবু, লিচু এবং পেয়ারা গাছের গুটি কলম পদ্ধতি

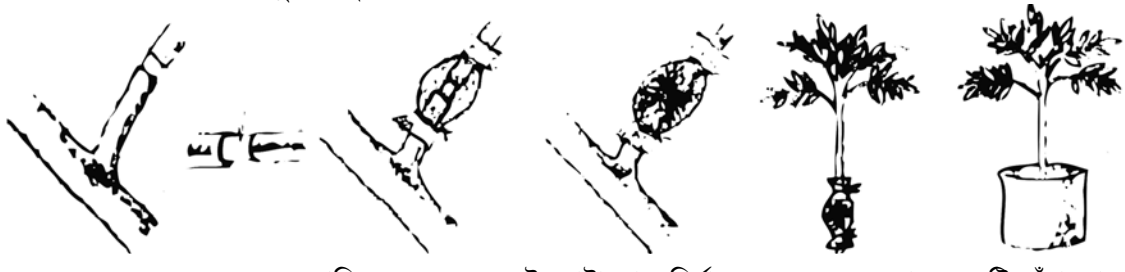

এক বছরের সতেজ ও সবল, পেন্সিলের থেকে একটু মোটা ডাল নির্বাচন করতে হয়। ডালের গুটি বাঁধা জায়গা যেখানে ছাল ধূসর রঙ হয়েছে, সেই অংশটুকু থেকে পাতা ও ছোট ছোট ডাল সরিয়ে আগে পরিস্কার করে নিতে হবে। ডালের পরিস্কার জায়গা গাঁটের একটু নিচে ধারালো ছুরি দিয়ে ডালের চারদিক ঘুরিয়ে ছাল গোল করে কেটে নিতে হবে। ঐ একই ভাবে ৩ সেমি নীচে আবার একবার ছুরি ঘুরিয়ে ডালের ছাল গোল করে কেটে দিতে হবে।

ডালের ওপর দুটো গোলাকার কাটা ছালের মাঝের অংশ ছুরি দিয়ে লম্বালম্বি কেটে ৩ সেমি অংশ তুলে ফেলতে হবে। ছাল তোলার পর ছুরির ধারালো ফলার উলটো দিক দিয়ে ঘষে ডালে লেগে থাকা ক্যাম্বিয়াম স্তর ভালো করে

তুলে দিতে হবে। এখন ভিজে মাটি ও গোবর সার দিয়ে তৈরী বল দিয়ে ডালের ছাল তোলা অংশে চাপা দিতে হবে। পাতলা সাদা পলিথিনের টুকরো দিয়ে ডালে লাগানো ঐ মাটি ও গোবরের বল টিকে ভালো করে জড়িয়ে দু-মাথা বাঁধতে হবে। সব গাছেই গুটি কলম সাধারণত বর্ষার সময় করা হয়, যেমন – ডালিম, বাতাবি লেবু, কাজু বাদাম প্রভৃতি।

কমলা, মোসাম্বি, গোলাপের চোখ কলম পদ্ধতি

প্রত্যেক ডালের গাঁটে সুপ্ত মুকুল থাকে, সময়ে এরা বেড়ে নতুন ডাল তৈরী করে। এই সুপ্ত মুকুলকে পার্শ্ব মুকুল বা চোখ বলে। মুকুল নির্বাচন করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত মুকুল যেন বেশী পুরানো বা বেড়ে না ওঠে। ভালো জাতের গাছের ডাল থেকে ধারালো ছুরি দিয়ে সাবধানে চোখের আকারে সতেজ মুকুল তুলে নিতে হবে। কাটা মুকুলে লেগে থাকা শক্ত ডালের অংশ খুব সাবধানে তুলে নিতে হবে যেন মুকুলের কোনোরকম আঘাত না লাগে। এইভাবে তৈরী মুকুল জলের পাত্রে কিছুক্ষণের জন্য রাখতে হবে যাতে মুকুল শুকিয়ে না যায়। এখন বুনো জাতের গাছের গায়ে মাটি থেকে ১৫ সেমি উপরে পাতা ও ডাল সরিয়ে পরিস্কার করে নিতে হবে। ডালের দুটো গাছের মাঝে ছুরি দিয়ে প্রথমে ছাল আড়াআড়ি কেটে ও পরে লম্বালম্বি ২ সেমি কেটে নিতে হবে। কাটা ছাল ছুরির পেছনের অংশ দিয়ে খুলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জলের পাত্রে রাখা মুকুল পরিয়ে দিতে হবে। এরপর পলথিনের চওড়া ফিতে দিয়ে ডালের চারিদিক ঘুরিয়ে ভালো করে পেঁচিয়ে নিতে হবে, ঐ সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জোড় দেওয়া মুকুল যেন পলিথিনে ঢাকা না পড়ে। কিছুদিনের মধ্যে দেখা যাবে মুকুল জোড়া লেগে বাড়তে শুরু করেছে। মুকুল ৩ সেমি মত বেড়ে উঠলে বুনো গাছের মাথা কেটে দিতে হবে। এইভাবে তৈরী চারা গাছকে চোখ কলমের গাছ বলে। যেমন – কমলালেবু, কুল, আপেল, গোলাপ প্রভৃতি।

রুট স্টক (Root Stock) এবং সায়ন (Scion): যে বুনো জাতের গাছ বা বীজের গাছ কলমের কাজে লাগানো হয় তাকে জোড় কলমের নীচের গাছ বা রুট স্টক (Root Stock) বলে আর মুকুল যে ভালো জাতের গাছ থেকে নিয়ে জোড় দেওয়া হয় তাকে জোড় কলমের উপরের গাছ বা সায়ন (Scion) বলে।

আমের পার্শ্বজোড় কলম পদ্ধতি

জমিতে বা মাটির টবে বেড়ে ওঠা এক থেকে দেড় বছরের বুনো জাতের গাছের গায়ে ১৫ – ২০ সেমি ওপরে ৩ – ৪ সেমি লম্বা ফালি ছাল সমেত একটু কাঠ চেঁছে একটা খাঁজ তৈরী করতে হবে (Root Stock) । একটা ভালো জাতের গাছের ১৫ সেমি লম্বা ডগার দিকের ডাল কেটে জোড় দিতে হবে। ডাল কাটার ৭ দিন আগে পাতা বিহিন করে নিতে হবে (Scion)।

জোড় দেওয়ার পর পলিথিনের ফিতে দিয়ে ভালো করে বেধে দিতে হবে যেন বাতাস বা জল না ঢোকে। কিছুদিনের মধ্যে ভালো জাতের গাছের জোড় দেওয়া ডাল বুনোগাছের ওপর বাড়তে শুরু করবে। তখন বুনো জাতের গাছের মাথা জোড় দেওয়া অংশের একটু ওপরে কেটে দিতে হবে। এইভাবে তৈরী করা যাবে ভালো জাতের নতুন চারা গাছ।

সহজে অ্যাজোলা প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন, অ্যাজোলার বীজ, অ্যাজোলা চাষের জন্য সিলপোলিন, জল, মাটি, কিছু গোবর ও সুপার ফসফেট, কোদাল

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৩ ঘন্টা

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	৮ মিনিট
২)	ভিডিও দেখানো হবেঃ "অ্যাজোলা কি- mp4	২ মিনিট
৩)	হ্যান্ডবিল ধরে আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ অ্যাজোলা কি, কেন অ্যাজোলা চাষ, অ্যাজোলার প্রকারভেদ ও খাদ্যগুণ	৩০ মিনিট
৪)	ভিডিও দেখানো হবেঃ "অ্যাজোলা চাষ- mp4	৫ মিনিট
৫)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ ভিডিও তে দেখানো "অ্যাজোলা চাষ" ও হ্যান্ডবিল – এ উল্লিখিত "অ্যাজোলা চাষ" সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিষয়	১৫ মিনিট
৬)	ভিডিও দেখানো হবেঃ গৃহপালিত প্রাণীদের "অ্যাজোলা কিভাবে খাওয়াবেন- mp4	২ মিনিট
৭)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ ভিডিও তে দেখানো ও হ্যান্ডবিলে বর্ণিত গৃহপালিত প্রাণীদের অ্যাজোলা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার	১৫ মিনিট
৮)	ভিডিও দেখানো হবেঃ "পাকা পিটে অ্যাজোলা ও অন্যান্য ব্যবহার- mp4	৩মি ৩০সে
৯)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	১০ মিনিট
১০)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ হাতে-কলমে অ্যাজোলা পিট তৈরীর আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিপর্বের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	১৫ মিনিট
১১)	প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষার্থীদের নিয়ে হাতে কলমে একটি অ্যাজোলা পিট প্রস্তুত করবে	১ ঘন্টা
১২)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ অন্তিম আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
১৩)	প্রশিক্ষার্থীদের অ্যাজোলার হ্যান্ডবিল ও পোষ্টার বিতরণ	

অ্যাজোলাকে আপন কর
নতুন পথে এগিয়ে চল

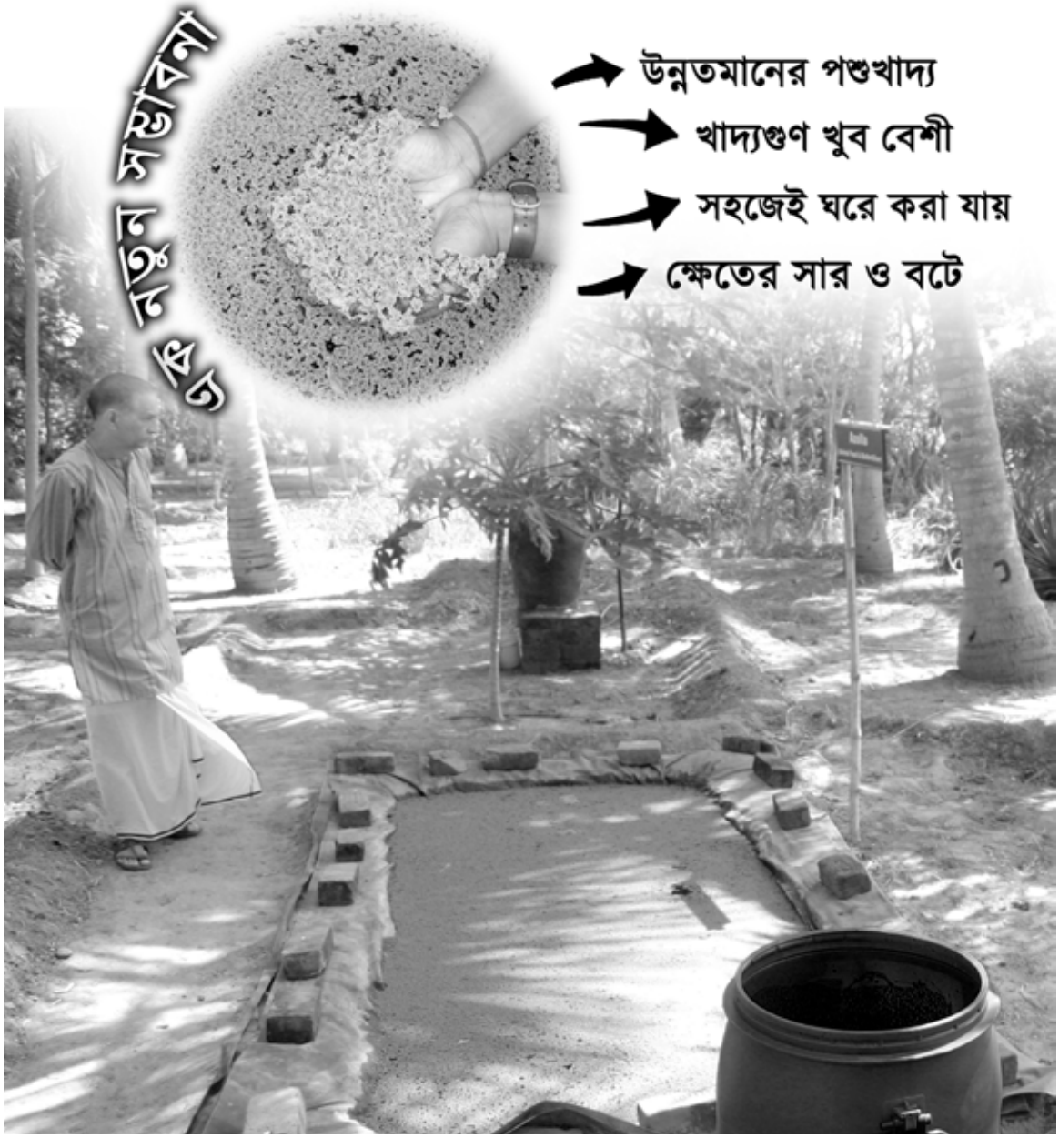

অ্যাজোলা কি?

অ্যাজোলা হল স্বাধীন ভাবে ভেসে বেড়ান একটি জলজ ফার্ণ। সাধারণত অ্যাজোলা ধানক্ষেত বা অগভীর জলেও জন্মায়। প্রোটিন সমৃদ্ধ এই ফার্ণ মূলতঃ কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। উচ্চ খাদ্যগুণ সম্পন্ন হওয়ায় বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই ফার্ণকে সবুজ প্রাণী খাদ্যের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন।

কেন অ্যাজোলা চাষ করবেন?

- বর্তমানে সাধারন ও গরীব মানুষের পক্ষে সুষম গবাদি খাদ্য যোগান দেওয়ার মত সামর্থ নেই
- দিনের পর দিন পশু চারণ ভূমি কমে গেছে/যাচ্ছে
- স্থানীয় ভাবে জঙ্গল ও অন্যান্য জায়গা থেকে পশু খাদ্য সংগ্রহ করা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে
- স্বল্প পরিসরে ও স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা যায়
- খাদ্যগুন খুব বেশি
- সহজে রক্ষণাবেক্ষণ করার সুবিধা

কি কি ধরনের অ্যাজোলা চাষ করা যায়?

প্রধানতঃ সারা পৃথিবীতে ছয় ধরনের অ্যাজোলা দেখা যায় - ১) অ্যাজোলা ক্যারোলিন, ২) অ্যাজোলা নিলোটিকা, ৩) অ্যাজোলা ফিলোকিউলয়েডস্, ৪) অ্যাজোলা মেক্সিকানা, ৫) অ্যাজোলা মাইক্রোফিলা, ৬) অ্যাজোলা পিনাটা

এর মধ্যে ফিলোকিউলয়েডস্ প্রজাতির অ্যাজোলা পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র অ্যাজোলা পিনাটা জন্মায়। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পিনাটা ও মাইক্রোফিলা প্রজাতির সংমিশ্রণে নূতন এক প্রজাতির অ্যাজোলা দেখা যাচ্ছে।

অ্যাজোলার বৃদ্ধি কি ভাবে হয়?

বংশ বৃদ্ধিঃ

অ্যাজোলার বংশ বৃদ্ধি অঙ্গজ জননের দ্বারা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক গবেষণাগারে স্পোর থেকে অ্যাজোলা চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যাজোলা তিন দিনে নিজের পরিমাণকে দ্বিগুনে পরিণত করতে পারে।

অ্যাজোলা কি ভাবে উৎপাদন করা যায় ?

উৎপাদন পদ্ধতি প্রধানত দুই প্রকারঃ- (ক) ফার্ম পদ্ধতি (খ) স্বল্প খরচে দেশীয় পদ্ধতি

(ক) ফার্ম পদ্ধতিঃ- সরকারী ফার্ম ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই পদ্ধতিতে উৎপাদন করা লাভজনক। এই পদ্ধতিতে শেড তৈরি করতে হয় বলে প্রাথমিক ভাবে খরচ একটু বেশি।

(খ) স্বল্প খরচে দেশীয় পদ্ধতিঃ- প্রথমে ৭.৫ ফুট x ৪.৫ ফুট পরিমাণ জায়গা ইট দিয়ে ঘিরে নিতে হবে। তারপর অল্প মাটি খুড়ে ও চারদিকে ইট পেতে ১০ ইঞ্চির মতো গভীরতা তৈরী করতে হবে। মাঝে ইট দিয়ে সমান ২ টি প্লটে ভাগ করতে হবে। এরপর ৯ ফুট x ৬ ফুট আয়তনের সূর্যের আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সহনশীল সিল্পোলিন পলিথিন ঐ জায়গায় বিছিয়ে দিতে হবে। এরপর ১০-১৫ কেজি চালা মাটি গুঁড়ো করে উক্ত জায়গাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে, ২ কেজি কাঁচা গোবর এবং ৩০ গ্রাম সুপার ফসফেট ১০ লিটার জলের মধ্যে মিশিয়ে উক্ত চাদরটির উপর সমান ভাবে ঢেলে দিতে হবে। অথবা পলিথিন ঐ জায়গায় বিছিয়ে দিতে হবে। ২-৩ ইঞ্চির মতো পুরু করে সমপরিমাণে মাটি ও গোবর সারের মিশ্রন ঐ পিটে ছড়িয়ে দিতে হবে। এরপর ৫-৬ ইঞ্চির

মতো জল দিতে হবে। ২ ইঞ্চি নিচে একটি নালা রেখে মুখে তারজালি দিতে হবে যাতে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল বেরিয়ে যেতে পারে এবং তারজালি অ্যাজোলা আটকাতে সাহায্য করবে। অন্ততঃ ৭-১০ দিন রাখার পর ৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট বা রক ফসফেট এবং ১০ গ্রাম কার্বোফুরান মেশাতে হবে। এরপর ১০০ গ্রামের মতো অ্যাজোলা মাইক্রোফিলা ঐ পিটে ছড়িয়ে দিতে হবে। ১২-১৫ দিন বাদে ঐ জায়গা থেকে প্রতিদিন ৫০০-৭০০ গ্রামের মতো অ্যাজোলা তোলা যাবে।

বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশঃ

(i) তাপমাত্রা ২০০ সেঃ - ২৮০ সেঃ হলে সব চেয়ে ভালো হয়

(ii) হাল্কা অর্থাৎ ৫০% পূর্ণ সূর্যালোক পেলে ভাল

(iii) আপেক্ষিক আদ্রর্তা ৬৫-৮০%

(iv) জল (ব্যাঙ্কে জমা) ৫-১২ সেমিঃ

(v) pH এর ৪-৭.৫

(vi) তাপমাত্রা বেশী থাকলে শেড নেট ব্যবহার করতে হবে।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য টিপস্ঃ

- ২০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ১ কেজি গোবর সার প্রতি সপ্তাহে দিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- অল্প পরিমাণে মিনারেল মিক্সার দিলে ভালো হয় যা কিনা অ্যাজোলার মধ্যে মিনারেলের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে।
- ৩০দিনের মাথায় ৫ কেজি করে বেড সয়েল সরিয়ে নতুন জল দিতে হবে যা নাইট্রোজেন আবদ্ধকরনে সহায়তা করবে ও মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে।
- ২০ দিন অন্তর ২৫-৩০% জল পাল্টাতে হবে এবং নূতন জল দিতে হবে যা নাইট্রোজেন আবদ্ধকরনে সাহায্য করবে।
- প্রতি ছয় মাস অন্তর সার এবং মাটির মিশ্রণ পরিবর্তন করে নতুন অ্যাজোলা ছাড়তে হবে।
- পোকামাকড়ের আক্রমণ বা রোগ লাগলে নতুন বেড তৈরি করতে হবে।

কি ভাবে অ্যাজোলা খাওয়াবেন?

ব্যবহারের পদ্ধতি বা শোধনের পদ্ধতি - পাত্র থেকে সদ্য তোলা অ্যাজোলাকে ভাল করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে একটি মাটির পাত্রে অর্ধেক ভর্তি জলের উপর ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে। এরপর জল থেকে তুলে ঝুড়ি বা অন্য পাত্রে বিছিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে ক্লোরোফিল ট্রিটমেন্ট করার পর গৃহপালিত প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। সদ্য উৎপন্ন অ্যাজোলা আলাদাভাবে খাওয়ানো যেতে পারে তবে অ্যাজোলার সঙ্গে অল্প পরিমাণে লবণ মিশিয়ে বা সুষম পশুখাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে গৃহপালিত প্রাণীরা অ্যাজোলা খেতে তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে যায়।

কোন গৃহপালিত প্রাণীকে কতটা পরিমাণে অ্যাজোলা খাওয়ানো যাবে?

অ্যাজোলা খুব পুষ্টিকর ও কম খরচে উৎপন্ন সবুজ খাদ্য যা দুধেল গাভী ও মহিষ, ছাগল, শুকর এবং হাঁস-মুরগিকে খাওয়ানো যায়। ক্লোরোফিল ট্রিটমেন্টের পর উৎপন্ন অ্যাজোলা খড়, সবুজ ঘাস ও সুষম পশুখাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে

নির্দিষ্ট পরিমাণে খাওয়ানো যাবে।

গাভীঃ- ১.৫ কেজি থেকে ২ কেজি প্রতিদিন ; ছাগলঃ- ২০০ গ্রাম প্রতিদিন ; মুরগীঃ- সুষম খাবার ও অ্যাজোলা ১:১ অনুপাতে ; হাঁস ও শুকরঃ- যতটা খাবে।

অ্যাজোলা খাওয়ালে দুধেল গাভী ও মহিষের দুধের পরিমাণ বাড়ে এবং মাংসের জন্য পালন করা প্রানীদের দৈহিক ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

অ্যাজোলায় কি কি খাদ্যগুণ আছে?

অ্যাজোলায় বিভিন্ন ধরণের পুষ্টিকর খাদ্যগুণ থাকায় অ্যাজোলা গৃহপালিত প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে ব্যবহার করতে বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেছেন। অ্যাজোলাকে বিশ্লেষন করলে (ডাই ওয়েট %) নিম্নলিখিত পদার্থগুলি পাওয়া যাবেঃ-

ছাই (অ্যাস) - ১০.৫%

ক্যাসিয়াম - ০.৪% - ১%

ম্যাগনেসিয়াম - ০.৫% - ০.৬%

ম্যাঙ্গানিজ - ০.১১% - ০.১৬%

লোহা - ০.০৬%

ক্লোরোফিলঃ- ০.৩৪% - ০.৫৫%

পটাসিয়াম - ২.০% - ৪.৫%

ক্রুড প্রোটিন - ২৮% - ৩০%

নাইট্রোজেন - ৪% - ৫%

ফসফরাস - ০.৫% - ০.৯%

মিশ্রিত শ্বেতসার - ৩.৫%

অন্যান্য ব্যবহারঃ

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য, মাছের খাবার হিসাবে ও ভার্মি-কমপোষ্টের কাঁচামাল হিসাবে অ্যাজোলা ব্যবহার করা যায়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগ, রায়গঞ্জ ব্লক

সহজে কেঁচোসার প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন, কেঁচো, সিলপোলিন ব্যাগ, গোবর, কোদাল, মাটি চালার চালুনি

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৩ ঘন্টা

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	প্রশিক্ষার্থীদের সাথে পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১০ মিনিট
২)	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বঃ চাষে কেঁচোসারের ভূমিকা	১৫ মিনিট
৩)	ভিডিও দেখানো হবেঃ "কেঁচোসার ব্যবহার করুন, ফলন দ্বিগুণ করুন- mp4	৫ মিনিট
৪)	ভিডিও ধরে আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ চাষের কাজে কেঁচোসারের উপযোগীতা	১৫ মিনিট
৫)	কেঁচোসার তৈরীর ভিডিও দেখানোর পূর্বে এই বিষয়ে প্রশিক্ষার্থীদের সম্মুখে এক সংক্ষিপ্ত ভূমিকা তুলে ধরা	১০ মিনিট
৬)	ভিডিও দেখানো হবেঃ "ধাপে ধাপে ভার্মি প্রস্তুতি- mp4	৬ মিনিট
৭)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ ভিডিও তে দেখানো "কেঁচোসার তৈরী" সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিষয়	২৫ মিনিট
৮)	যে কজন প্রশিক্ষার্থী থাকবেন তাদেরকে কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত করা হবে এবং ভার্মিকম্পোষ্ট-এর উপর একটি ক্যুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করবেন প্রশিক্ষক এবং যে গ্রুপটি জয়ী হবে সেই গ্রুপটি ভার্মিকম্পোষ্ট প্রস্তুত করার জন্য একটি সিলপোলিন ব্যাগ পাবে	৪৫ মিনিট
৯)	প্রশিক্ষক হাতে কলমে প্রশিক্ষার্থীদের নিয়ে হাতে কলমে সিলপোলিন ব্যাগে ভার্মিকম্পোষ্ট প্রস্তুত করা দেখাবে	৩০ মিনিট
১০)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ অন্তিম আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
১১)	প্রশিক্ষার্থীদের ভার্মিকম্পোষ্ট - এর হ্যান্ডবিল ও পোষ্টার বিতরণ	৫ মিনিট

ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার

কেঁচো গাছপালা থেকে তৈরী মৃত জৈব পদার্থ খেয়ে যে মলত্যাগ করে সেটা গাছের বা ফসলের উর্বর খাদ্যে পরিণত হয়। একটি কেঁচো তার সমান ওজনের ওই সব জৈব পদার্থ প্রতিদিন খেয়ে সার তৈরী করে।

চাষে কেঁচোর ভূমিকাঃ

কেঁচোর মলে ওই জমির মাটির তুলনায় ৪-৬ গুণ বেশী নাইট্রোজেন, ৫-৭ গুণ গাছের গ্রহণযোগ্য ফসফেট (বিনিময়যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য ফসফরাস) এবং প্রায় ১১ গুণ বেশী পটাশ থাকে। এর খাদ্যনালীতে মাটির তুলনায় ৫০০-১০০০ গুণ বেশী উপকারি জীবাণু থাকে যা অল্প সময়ে জৈব পদার্থকে হিউমাসে পরিবর্তন করতে পারে। মাটিতে কেঁচোর মলমূত্র, শ্লেষ্মা মিশে মাটির অম্লতা ও ক্ষারত্বের মধ্যে একটা ভারসাম্য আনতে সাহায্য করে। কেঁচো মাটিকে ওলট পালট করে সছিদ্র করে। ফলে মাটিতে বাতাস চলাচল, মাটির কার্যকরী গভীরতা, জলধারণ ক্ষমতা ও জলনিকাশী ব্যবস্থা ভালো হয়। কেঁচো মাটিতে বসবাসকারী রোগ জীবাণু, দুষণকারী রাসায়নিক পদার্থ কমায়।

কেঁচোর পরিবেশঃ

কেঁচো উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া ও ছায়াঘন পরিবেশ পছন্দ করে। মাটিতে কেঁচো বসবাসের আদর্শ পরিবেশ হলো- তাপমাত্রা - ১৫ ডিগ্রি - ৩০ ডিগ্রি সেঃ, আর্দ্রতা - ৬০-৭০ শতাংশ, মার্টির অম্ল-ক্ষার ভারসাম্য বা PH7-৮.৫ যদিও এর তারতম্য কেঁচো অনেকটাই সহ্য করতে পারে।

সার তৈরীর উপযুক্ত কেঁচোর জাত নির্বাচনঃ

কঠিন জৈব বর্জ্য বস্তুকে পচনের মাধ্যমে দূষণ দূর করে উৎকৃষ্ট জৈব সারে পরিণত করাই কেঁচো পালনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে সঠিক প্রজাতির কেঁচো সংগ্রহ করতে হবে। যেসব প্রজাতির কেঁচোর প্রধান খাদ্য জৈব বস্তু, যাদের বংশ বৃদ্ধির হার বেশী, প্রচুর পরিমাণে খায় ও মলত্যাগ করে, জৈব বস্তুর পচনের ফলে উদ্ভূত পরিবেশ ও আবহাওয়ার তারতম্য সহ্য করার ক্ষমতা যাদের বেশী সেই প্রজাতিগুলিই সংগ্রহ করতে হবে। এগুলি প্রধানত লালচে বাদামী রঙের, মখেল দিকটা লালচে, পূর্ণবয়স্ক অবস্তায় ১৫ – ২০ সেমি লম্বা, মুখের দিক তুলনায় ছুঁচোলো ও পেছনের দিক অপেক্ষাকৃত ভোঁতা হয়। এরা মাটির স্তরে থাকতে ভালোবাসে।

সার তৈরীর ক্ষমতা ও উপকরণের গুণাগুণঃ

সাধারণত সার তৈরীর উপযোগী জাতের কেঁচো নিজের দেহের প্রতি গ্রাম ওজন পিছু ১০০-৩০০ মিলিগ্রাম খাদ্য প্রতিদিন খায়। এর মধ্যে বেশীর ভাগটাই জৈব বজ্য পদার্থ থাকে। দেখা গেছে ১ লক্ষ ২০ হাজারটি পূর্ণবয়স্ক কেঁচো বছরে প্রায় ১৭-২০ মেট্রিক টন জৈব পরিপাক করে সারে পরিণত করতে পারে। উদ্ভিদ অবশেষ জাতীয় খাদ্যই ওদের বেশী পছন্দ। তবে মাটিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু এবং মাটি এরা খায়। মাছ-মাংস বা অন্যান্য আমিষ খাদ্যের অবশেষ, লেবু, টমেটো, তেঁতুল ইত্যাদি টক বস্তু, লংকা এরা পছন্দ করে না।

মাধ্যমের উপকরণ ও তাদের মিশ্রণঃ

১ ভাগ মাটি, ২ভাগ কাঁচা জৈব বস্তু (পাতা, আগাছা, কচুরিপানা- শিকড় বাদ দিয়ে, গোবর বা অন্যান্য পশুপাখির মলমূত্র) ও ৩ ভাগ শুকনো খড় কুটো (ধান, গম, ডাল ইত্যাদির খড়, ভুসি, কুঁড়ো ইত্যাদি) এবং ৪০-৫০% আদ্রতা যাতে বজায় থাকে সেই পরিমাণমতো জল নিতে হবে। পাতা, খড় কুটো (বিশেষ করে শুকনো খড় কুটো) কুচিয়ে নিতে হবে। সমস্ত জৈব বস্তু ও জল সমভাবে মিশিয়ে গতে, পাত্রে বা টিপি করে কাদা দিয়ে উপরিভাগ লেপে দিতে হবে এবং ৪-৫ সপ্তাহ এ অবস্থায় পচিয়ে উল্টে পাল্টে মেশাতে হবে ও ১-২ দিন ঠান্ডা ও বাতাস খাইয়ে তবে কেঁচোর জন্য উপযুক্ত উপকরণ মাধ্যম তৈরী হবে।

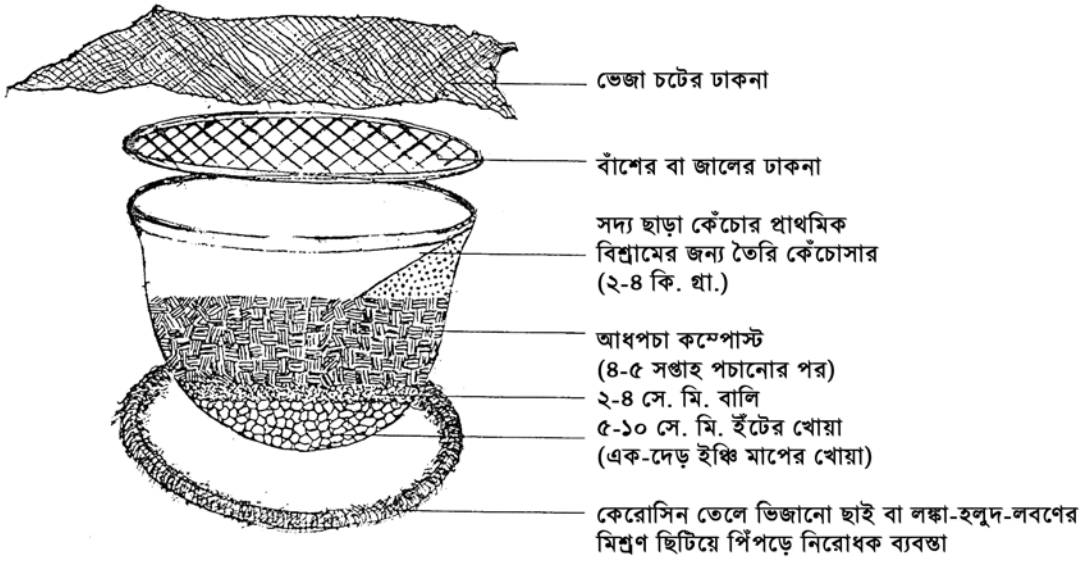

কেঁচো সার তৈরির পদ্ধতিঃ

চাড়ি বা চৌবাচ্চা এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে জল ও রাদে লাগবে না । চৌবাচ্চার বা চাড়ির তলদেশে ৩ ইঞ্চি উচ্চতায় ইটের টুকরো বিছিয়ে দিতে হবে তার উপর ১/২ ইঞ্চি সাদা বা লাল বালি দিয়ে ভরে দিতে হবে। তার উপরে হালকা করে মাটি দিতে হবে। এরপর অর্ধপচনশীল জৈব বস্তু ঢেলে দিয়ে সমান করে দিতে হবে। প্রতি কেজি উপকরণের জন্য ১০ থেকে ১৫ টি কেঁচো ও ৫০ গ্রাম ডিমসহ কেঁচো সার জৈব বস্তুর মধ্যে দিতে হবে, উপরে ঢেকে দেওয়া ভিজে চটের বস্তা শুকিয়ে গেলে পুনরায় জল দিয়ে বস্তাটি ভিজিয়ে দিতে হবে, ৩০-৪০ দিনের পর সার তৈরি হয়ে যাবে। তবে মনে রাখতে হবে কেঁচো সার চৌবাচ্চা থেকে তোলার জন্য ৩-৪ দিন আগে চটের উপর জল দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

কেঁচো সারের উপযোগিতাঃ

মাত্র দশ লক্ষ কেঁচো ২৫ দিনে ১২০ টন জৈব পদার্থকে পচানারে মাধ্যমে সারে পরিণত করতে পারে। যে জমিতে কেঁচো নেই সেই জমির তুলনায় যে জমিতে কেঁচো আছে তার মাটিতে ৫ গুণ বেশী গাছের গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন, ৭ গুণ বেশী ফসফরাস, ১১ গুণ বেশী পটাশ এবং ২ গুণ বেশী ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। এছাড়া কেঁচো মাটিতে রাগে জীবাণু দমন করে ও উপকারী জীবাণু, বীজাণুদের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কেঁচোর নিসৃত লালা রসে এমন কিছু পদার্থ থাকে যা গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কেঁচো সারের মিশ্রণ দিয়ে গুটি কলম করলে বা কাটিং লাগালে তাড়াতাড়ি শিকড় গজায় ও বীজের অঙ্কুরোদগম ভালো হয়। কেঁচো জৈব পদার্থ হজম করে তার কার্বনকে কমায়, ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের অনুপাত বাড়ে, গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সার তৈরী হওয়ার পর সার ঘেঁকে নেওয়ার সময় পূর্ণবয়স্ক (বড় বড়) কেঁচোগুলিকে আলাদা করে হাঁস-মুরগীর বা মাছের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। রাদে শুকিয়ে গুঁড়া করে বাগানের সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। কেঁচো ও কেঁচো ধোওয়া নির্য্যাস ফসলের পাতায় স্প্রে করলে গাছের বৃদ্ধিকারক হিসেবে কাজ করে।

কেঁচো সার তৈরী হয়েছে তা বোঝার উপায়ঃ

১) যে সমস্ত উপকরণ দেওয়া হয়েছে তা বাঝো যাবে না

২) কালচে বাদামী রঙের হবে

৩) দানা চায়ের মতো দেখতে হবে

৪) অসংখ্য ছোট ছোট কেঁচো দেখা যাবে

৫) উপরে কেঁচোর ডিম দেখা যাবে

৬) আলাদা একটা গন্ধ পাওয়া যাবে

কেচো সার সংগ্রহ ও সংরক্ষণঃ

চাড়ি বা চৌবাচ্চার মধ্যে রাখা চটের বস্তা সরিয়ে দিয়ে আস্তে করে উপরের অংশটিকে হালকা করে তুলে একধারে সরিয়ে দিতে হবে এবং একদিন এই ভাবে রাখতে হবে যাতে বড় কেঁচো গুলো নিচের দিকে চলে যায়। কেঁচো সার গুলিকে নিয়ে মিহি চালুনী দিয়ে চেলে নিতে হবে। চালুনীর উপর বড় কেঁচো ও ডিম থাকবে সেগুলো আবার অর্ধপচনশীল জৈব বস্তুর মধ্যে দিতে হবে, চালুনীর নিচে পড়ে থাকা সার নিয়ে ব্যবহার করা বা সংরক্ষণ করে রাখা। তবে সংরক্ষণ এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে বৃষ্টির জল বা রোদ না লাগে।

ব্যবহারঃ

নার্সারি, কলম তৈরী, টবে বা মূল জমিতে কেঁচো সার স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন ফসলে যে পরিমাণে কম্পোস্ট সাধারণত ব্যবহার করা হয়, তার এক তৃতীয়াংশ কেঁচো সার ব্যবহার করলেও ভালো ফল পাওয়া যায়। কেঁচো সারের জলীয় নির্যাস সরাসরি গাছে স্প্রে করলে গাছ। সতেজ হয়।

সতর্কতাঃ

১) মিশ্রণে কেঁচোর খাদ্য সর্বদা পর্যাপ্ত থাকতে হবে। খাবার শেষ হলেই কেঁচো পালাবার চেষ্টা করে।

২) মিশ্রণের আর্দ্রতা রক্ষার জন্য নিয়মিত জল দিতে হবে। অবশ্যই বেশী জল দেওয়া চলবে না। মাটোমুটি ৬০-৭০ শতাংশ আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে।

৩) কেঁচো যাতে বেরিয়ে না যায় সেজন্য ঢাকনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বাক্স বা চৌবাচ্চার দেওয়াল অনেকটা উঁচু করেও কেঁচো আটকানো যায়।

৪) তাপমাত্রা কম বেশী ২৫-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখা দরকার। ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে বাক্স বা চৌবাচচার ওপরে ছাউনি ও মিশ্রণের ওপর শুকনো পাতা, খড় ইত্যাদি দিয়ে ঢাকা দেওয়া দরকার। রোদ, বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে চালার তলায় সার তৈরী করতে হবে। ভেজা চট দিয়ে ঢেকে রাখলে ভালো হয়।

৫) রাসায়নিক সার বা ওষুধ দেওয়া চলবে না।

৬) ইঁদুর, মুরগী ও পিঁপড়ের থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে। লংকা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো ও লবন প্রতিটি ১০০ গ্রাম করে ১০ লিটার জলে গুলে সার তৈরীর পাত্র বা চৌবাচ্চার চারপাশে ৭-১০ দিন অন্তর স্প্রে করলে পিঁপড়ের উপদ্রব কমবে। হাঁসমুরগী, পাখির উপদ্রব থেকে বাঁচাতে বাঁশের তৈরী বরফি বেড়া বা ঢাকনা দেওয়া দরকার।

৭) সহজ পচনশীল নয় এমন জৈব বস্তু যেমন পার্থেনিয়াম, বেড়া কলমী পাতা, লেবু, কাচা নিম পাতা বা নিমের যে কোন অংশ পিটের মধ্যে দেওয়া যাবে না।

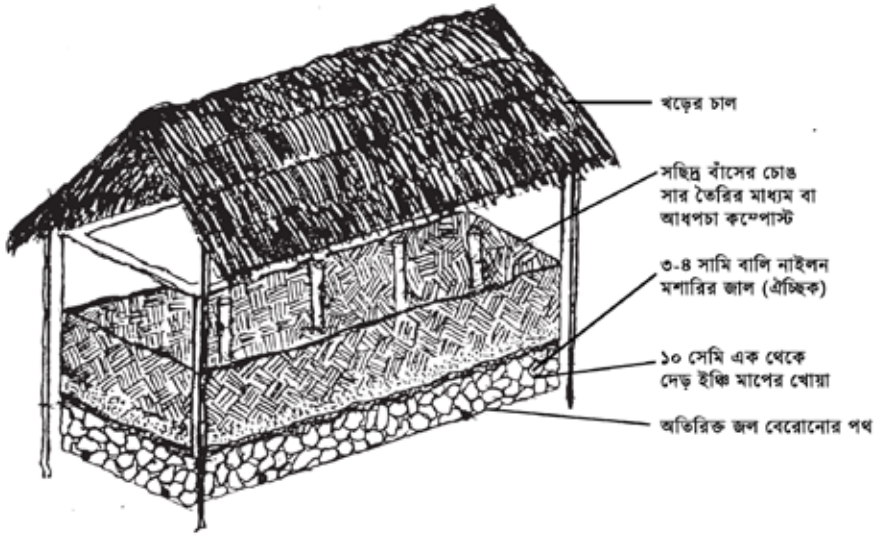

চৌবাচ্চায় বেশি পরিমান সার তৈরির পদ্ধতি

আফটার স্কুলে ঘরোয়া ভাবে হাঁস মুরগীর খাবার তৈরীর প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন, গম, ধান, কালো তিল/সরিষা খোল, সয়াবিন খোল, শুটকি মাছের গুড়ো, ঝিনুক ভাঙা, খাবার লবণ, খনিজ লবণ, ভিটামিন, ১টি প্লাষ্টিক পাত্র, জল, দাড়িপাল্লা ও বাটখারা, চট, চামচ বা হাতা

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৪ ঘন্টা

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১৫ মিনিট
২)	খাদ্য তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে আলোচনা	২০ মিনিট
৩)	বোর্ড ও পেন – এর মাধ্যমে বিভিন্ন বয়সের হাঁস - মুরগীর জন্য কি কি অনুপাতে খাদ্য উপাদান নিয়ে খাদ্য তৈরী হবে সেই বিষয়ক আলোচনা	৪০ মিনিট
৪)	খাদ্য প্রস্তুতিকরণ নিয়ে ভিডিও দেখানো হবেঃ "GHOROYA BHABE HANS MURGIR KHABAR TOIRI- mp4"	৫ মিনিট
৫)	প্রশিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং হ্যাণ্ডবিল বিতরণ	৩০ মিনিট
৬)	ভিডিও দেখানো হবেঃ "হাঁসের খাবার তৈরীর সহজ উপায়- mp4	১০ মিনিট
৭)	ভিডিও – টি নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
৮)	হাতে-কলমে ঘরোয়া ভাবে খাবার তৈরীর আগে প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিপর্বের আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	১৫ মিনিট
৯)	প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষার্থীদের নিয়ে হাতে কলমে ৫ কেজি খাবার প্রস্তুত করবে	১ ঘন্টা ১৫ মিনিট
১০)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ অন্তিম আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট

ঘরোয়া ভাবে সহজে হাঁস-মুরগির খাদ্য তৈরি

বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি পালন শুরু হয়েছে। বর্তমানে হাঁস-মুরগির খামার (পোল্ট্রি ফিড) বেশ লাভজনক ব্যবসা হিসেবে পরিচিত। আবার হাঁস-মুরগির খাবার তৈরি করে এসব খামারে সরবরাহ করাও বেশ লাভজনক ব্যবসা হতে পারে। আমাদের দেশে পোলট্রি ফার্মের প্রধান সমস্যা হচ্ছে মুরগির রোগবালাই এবং সুষম খাদ্যের অভাব। বাজারে বিক্রির জন্য চালের খুদ, গমের ভূষি, চালের কুড়া, খৈল ইত্যাদি মিশিয়ে হাঁস-মুরগির খাদ্য তৈরি করা হয়ে থাকে কিন্তু বাড়িতে খুব সহজেই নিজেরাই হাঁস-মুরগির জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুত করে নেওয়া যায়।

বাজার সম্ভাবনাঃ

বাজারে বর্তমানে বেশ কয়েক ধরণের পোলট্রি ফিড তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে কিছু আছে যাদের উৎপাদনসামগ্রীর মূল্য গ্রামের দরিদ্র সাধারণ মানুষদের হাতের নাগালের বাইরে আবার দেখা যায় অনেক সময় উৎপাদনের সময় যে মান থাকে ব্যবহারের সময় পর্যন্ত সে মান আর অক্ষুণ্ন থাকে না। ফলে ওই সব খাবার খেয়ে হাঁস-মুরগির স্বাস্থ্যহানীও ঘটে। অনেকে ছোট ছোট হাঁস-মুরগির খামারী খাদ্য তৈরিকে ঝামেলা মনে করেন। তারা বাজার থেকে তৈরি খাদ্যদ্রব্য কিনে থাকেন কিন্তু খুব সহজেই আর সুলভ মূল্যে এসব খাদ্য বাড়িতেই প্রস্তুত করা যায় আবার অনেকে এই খাদ্য প্রস্তুত করে তারা বিক্রি করে এক অতিরিক্ত জীবিকার উপায় করতে পারে।

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

স্থায়ী যন্ত্রপাতিঃ ১টি পাত্র, দাড়িপাল্লা, চট, ১ টি চামচ বা হাতা, বিভিন্ন খাদ্য উপাদান

খাবার প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালঃ গম, ধান/খুঁদ, কালো তিল/ সরিষা/ বাদাম খোল, সয়াবিন খোল, শুটকি মাছের গুড়ো, ঝিনুক ভাঙা, খাবার লবণ, খনিজ লবণ, ভিটামিন

খাদ্য তৈরির নিয়মঃ

১। ৫ কেজি খাবার তৈরী করার জন্য উপরের তালিকা অনুযায়ী খাদ্য উপাদানগুলো মেপে নিতে হবে।

২। খাদ্য উপাদানগুলো রোদে দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।

৩। উপাদানগুলো গুঁড়া করে নিতে হবে। এগুলো গমভাঙ্গা মেশিনে গুঁড়া করা যায়। আবার ঢেঁকিতেও গুঁড়া করা যায় তবে এতে খুব বেশি মিহি হবে না, আবার সময়ও বেশি লাগবে।

৪। উপাদানগুলো চালুনীতে চেলে নিতে হবে।

৫। মাপটি সঠিক হবার জন্য প্রত্যেকটি গুড়া আলাদা আলাদা মেপে নিতে হবে।

৬। এরপর একটি বড় পাত্রে সবগুলো খাদ্য উপাদান একত্রে ঢালতে হবে। কাঠের হাতা দিয়ে এগুলো ভালোভাবে মেশাতে হবে।

বিভিন্ন বয়সের মুরগীর জন্য সুষম খাদ্য তৈরির একটি ফরমুলা

১ দিন থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত বয়সের মুরগীর ৫ কেজি সুষম খাদ্য তৈরীর জন্য ফরমুলা

খাদ্য উপাদান	পরিমান (%)	৫ কেজি জন্য প্রয়োজন
ভুট্টা/গম/চালের খুঁদ	৩৫	১৭৫০ গ্রাম
বাদাম/ কালো তিল/ সরিষা খোল	৩০	১৫০০ গ্রাম
শুঁটকি মাছের গুড়ো	৮	৪০০ গ্রাম
রাইস পালিশ/ কুঁড়ো/ গমের ভূষি	২৪	১২০০ গ্রাম
বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্যের মিশ্রণ	৩	১৫০ গ্রাম

ডিম পাড়ার আগেঃ

খাদ্য উপাদান	পরিমান (%)	৫ কেজি জন্য প্রয়োজন
ভুট্টা/গম/চালের খুঁদ	৪৫	২২৫০ গ্রাম
বাদাম/ কালো তিল/ সরিষা খোল	১৫	৭৫০ গ্রাম
শুঁটকি মাছের গুড়ো	৬	৩০০ গ্রাম
রাইস পালিশ/ কুঁড়ো/ গমের ভূষি	৩০	১৫০০ গ্রাম
বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্যের মিশ্রণ	৩	১৫০ গ্রাম
খাবার লবণ	১	৫০ গ্রাম

ডিম পাড়া শুরুর ১ সপ্তাহ আগে থেকে শেষ পর্যন্তঃ

খাদ্য উপাদান	পরিমান (%)	৫ কেজি জন্য প্রয়োজন
ভুট্টা/গম/চালের খুঁদ	৪৮	২৪০০ গ্রাম
বাদাম/ কালো তিল/ সরিষা খোল	২০	১০০০ গ্রাম
শুঁটকি মাছের গুড়ো	৭	৩৫০ গ্রাম
রাইস পালিশ/ কুঁড়ো/ গমের ভূষি	২২	১১০০ গ্রাম
বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্যের মিশ্রণ	৩	১৫০ গ্রাম

বিভিন্ন বয়সের হাঁসের জন্য সুষম খাদ্য তৈরির একটি ফরমুলাঃ

খাদ্য উপাদান	পরিমান (%)	৫ কেজি জন্য প্রয়োজন	পরিমান (%)	৫ কেজি জন্য প্রয়োজন	পরিমান (%)	৫ কেজি জন্য প্রয়োজন
	০ – ৩ সপ্তাহ (বাচ্চা অবস্থায় খাবার)		৪ – ২০ সপ্তাহ (বাড়ন্ত অবস্থায় খাবার)		২১ সপ্তাহের পর থেকে (বাড়ন্ত অবস্থায় খাবার)	
ভুট্টা/চালের খুঁদ	৩০	১৫০০ গ্রাম	৩০	১৫০০ গ্রাম	৩৫	১৭৫০ গ্রাম
গম ভাঙা	২০	১০০০ গ্রাম	৩০	১৫০০ গ্রাম	২০	১০০০ গ্রাম
তিল/ সরিষা/ সয়াবিন খোল	২৫	১২৫০ গ্রাম	২০	১০০০ গ্রাম	১৭	৮৫০ গ্রাম
শুঁটকি মাছের গুড়ো	১২	৬০০ গ্রাম	১২	৬০০ গ্রাম	১০	৫০ গ্রাম
ঝিনুক গুড়ো	১	৫০ গ্রাম	১	৫০ গ্রাম	৬	৩০০ গ্রাম
খনিজ লবণ	২	১০০ গ্রাম	২	১০০ গ্রাম	২	১০০ গ্রাম
কুঁড়ো	১০	৫০০ গ্রাম	৫	২৫০ গ্রাম	১০	৫০০ গ্রাম

যদি হাঁস ছেড়ে পালন করা হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত সুষম খাদ্য তৈরির একটি ফরমুলাঃ

খাদ্য উপাদান	পরিমান (%)	৫ কেজি জন্য প্রয়োজন
ভুট্টা/গম/ ছোট দানাশষ্য/ চালের খুঁদ	৩৫	১৭৫০ গ্রাম
বাদাম/ কালো তিল/ সরিষা খোল	১০	৫০০ গ্রাম
শুঁটকি মাছের গুড়ো	২০	১০০০ গ্রাম
ঝিনুক গুড়ো	৩	১৫০ গ্রাম
খনিজ লবণ	২	১০০ গ্রাম
কুঁড়ো	৩০	১৫০০ গ্রাম

খাওয়ানোর নিয়মঃ

বর্ষা মৌসুমে অর্ধছাড়া অবস্থায় পালনকৃত বাচ্চা হাঁস মুরগীকে দৈনিক ৪০ গ্রাম এবং বয়স্কগুলোকে ৬০ গ্রাম হারে সুষম খাদ্য দিতে হবে। তবে শুষ্ক মৌসুমে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমান কমে যায় বলে এসময় ছেড়ে খাওয়ানোর পাশাপাশি ৭০ থেকে ৮০ গ্রাম খাদ্য সরবরাহ করা দরকার।

যদি প্রতি দিন গুগলি/ঝিনুক, শামুক খাওয়ানো যায় বা খায় তাহলে মাছের গুঁড়ো না দিলেও চলবে। উক্তদান খাদ্য যদি ভাতের ফ্যানের সাথে মাখিয়ে দেওয়া হয় তা হলে চালের খুঁদ অনুপাত কম দিলে চলবে।

মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে দ্রুত বনায়নের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন, প্রশিক্ষার্থীদের মাঠে নিয়ে গিয়ে হাতে-কলমে মিয়াওয়াকির প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ, এলসিডি প্রোজেক্টর ও সাউন্ড সিস্টেম।

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৪ ঘঃ ১৫ মিঃ

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১৫ মিনিট
২)	পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে দ্রুত বনায়নের মূল আলোচনায় প্রবেশ	৪০ মিনিট
৩)	সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
৪)	মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে দ্রুত বনায়ন শীর্ষক mp4 ভিডিও প্রদর্শন	১০ মিনিট
৫)	সামগ্রিকভাবে মিয়াওয়াকি পদ্ধতি রূপায়ণ নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব	৪৫ মিনিট
৬)	বাইরে গিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার আগে আলোচনা চালাতে চালাতে বোর্ডে চক বা মার্কার পেন ব্যবহার করে কীভাবে মিয়াওয়কি বনায়ন করতে হবে তা বোঝানো	৪৫ মিনিট
৭)	প্রশিক্ষণ কক্ষের বাইরের কোনও ফাঁকা জমিতে বিভিন্ন উপকরণ সহযোগে হাতে-কলমে মিয়াওয়াকি পদ্ধতির প্রশিক্ষণ	১ ঘণ্টা ১০ মিনিট
৮)	মিয়াওয়াকি পদ্ধতির লিফলেট বিতরণ	১৫ মিনিট

মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে দ্রুত জঙ্গল তৈরি

মিয়াওয়াকি পদ্ধতির বিশেষত্বঃ

১) মাটির সঙ্গে বিভিন্ন উপকরণ মিশিয়ে ঢিপি তৈরি

২) স্থানীয় প্রজাতির গাছ নির্বাচন

৩) লেয়ার বা স্তর তৈরির জন্য বিভিন্ন উচ্চতার গাছ নির্বাচন

৪) প্রতিটি ঢিপিতে খুব ঘনভাবে (প্রতি বর্গমিটারে ৩টি করে) চারা রোপণ

৫) চারা রোপণের পর মালচিং করে মাটি ঢেকে ফেলা

৬) মালচিং-এর উপরেই জলসেচ

৭) হোসপাইপে ঝাঁঝরি লাগিয়ে জলসেচ

৭) প্রতিটি ঢিপিতে যথাযথ নিকাশির ব্যবস্থা

সংক্ষেপে মিয়াওয়াকি পদ্ধতিঃ

১) বাছাই করা জমি পরিষ্কার –

যে জমিতে মিয়াওয়াকি জঙ্গল করা হবে সেই জমিটিকে প্রথমে ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে।

২) পরিষ্কার জমির সীমা নির্দেশ ও নকশা তৈরি

জমি প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর দড়ি ও চুনের সাহায্যে জমির সীমানা নির্দেশ করতে হবে।

এরপর কাগজে প্রস্তাবিত মিয়াওয়াকি জঙ্গলের একটি নকশা তৈরি করতে হবে। অনেকটা জমির ওপর জঙ্গল তৈরি করতে হলে নকশা জলের পাইপলাইন, মাল মজুতের জায়গা সহ যাবতীয় জিনিসের উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

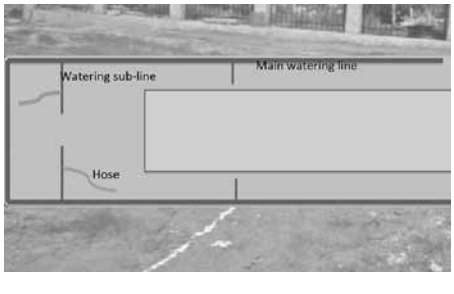

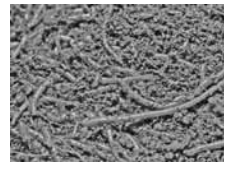

৩) বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

ক) বায়োমাস তৈরির জন্য – মিয়াওয়াকি পদ্ধতিতে জঙ্গল তৈরির জন্য প্রথমেই মাটি তৈরি করতে হয়। বিভিন্ন জিনিস মিশিয়ে বায়োমাস তৈরি করে তা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তা মাটিতে মেশাতে হয়।

বায়োমাসের উপকরণঃ

- ছিদ্র তৈরিকারী পদার্থ – ধানের খোসা, গমের খোসা, ভূট্টার ভাঙা খোসা, বাদামের ভাঙা খোসা ইত্যাদি।
- জল ধারণকারী পদার্থ – আখের শুকনো ডাল, কোকো পিট ইত্যাদি।
- সার – গোবর, কেঁচোসার, ছাগলের মল ইত্যাদি।

বায়োমাস তৈরি

বায়োমাসের জন্য প্রয়োজনীয় এইসব উপকরণ সংগ্রহ করার পর তা জেসিবি বা শ্রমিক লাগিয়ে ভাল করে মিশ্রণ করে মজুত করে রাখতে হয়।

খ) জীবমৃত বা পঞ্চগব্য তৈরি জন্য – আবশ্যিক না হলেও এক্ষেত্রে চারা রোপণের আগে মাটিতে নির্দিষ্ট অনুপাতে পঞ্চগব্যও মেশালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পঞ্চগব্যের উপকরণ (১ একর জমিতে)ঃ

• দেশি গরুর গোবর	১০-১৫ কেজি
• গোমূত্র	৩-৪ লিটার
• মিষ্টি গুড়	১-২ কেজি
• ডালের বেসন	২ কেজি
• স্বাভাবিক জঙ্গলের মাটি	২-৩ মুঠো
• জল	২০০-২৫০ লিটার

পঞ্চগব্য তৈরিঃ

এই সমস্ত উপকরণ ভাল করে জলে মিশিয়ে পঞ্চগব্য তৈরি করতে হয়ে। জমির আয়তন অনুযায়ী পঞ্চগব্যের উপকরণের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়।

গ) মালচিং করার জন্য – মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য এই মালচিং করা হয়ে থাকে। তবে মিয়াওয়াকি পদ্ধতির বিশেষত্ব হল এক্ষেত্রে মালচিং ৬-৮ মাস রাখতেই হয়।

মালচিং-এর উপকরণঃ

- ধানের খড়, গমের খড়, যবের বৃন্ত, ভূট্টার বৃন্ত ইত্যাদি
- ১.৫-২ ফুট উচ্চতার ৩০টি বাঁশের খুঁটি (প্রতি ঢিপির জন্য)
- ৩-৪ কেজি পাটের দড়ি (প্রতিটি ঢিপির জন্য)

ঘ) চারা সোজা রাখার জন্য বাঁশের কঞ্চি – ঢিপিতে চারা রোপণ করার আগে চারার সমসংখ্যক ১ মিটার বা তার চেয়ে সামান্য বেশি উচ্চতার বাঁশের কঞ্চি বা সরু কাঠি জোগাড় করে রাখতে হবে। যা চারাগুলোকে সোজা রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। চারাকে বাঁশের কঞ্চির সঙ্গে বাঁধার জন্য পাটের সরু দড়ি ব্যবহার করতে হবে।

৪) মাটি প্রস্তুত ও ঢিপি তৈরি করা

জমিতে থাকা যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় বস্তু সরিয়ে ফেলে জমির সব আগাছা নির্মূল করে জমির মাটি ভাল করে সমান করতে হবে। এবার নকশা অনুযায়ী ওই জমিতে এক বা একাধিক ঢিপি তৈরি করতে হবে।

• ঢিপি তৈরির জন্য ১০০ বর্গমিটার (২০ X ৫ মিটার) ও ১ মিটার গভীর গর্ত করতে হবে।

- প্রাপ্ত মাটি দুটি সমান ভাগ করে রেখে দিতে হবে।
- গর্তে হাত দিয়ে কিছুটা বায়োমাস ছড়িয়ে দিতে হবে।
- বাকি বয়োমাস দুটো সমান ভাগে ভাগ করতে হবে।
- এরপর অর্ধেক মাটি গর্তে ফেলতে হবে।
- তার ওপর অর্ধেক বায়োমাস বিছিয়ে দিতে হবে।

• একইভাবে আবার বাকি অর্ধেক মাটি ফেলুন।

• শেষে বাকি বায়োমাস এবং পঞ্চগব্য ভাল করে মাটিতে ছড়িয়ে দিন।

চারা রোপণের জন্য ঢিপি প্রস্তুত।

৫) গাছ ও প্রজাতি নির্বাচন

মনে রাখতে হবেঃ

- স্থানীয় কোনও স্বাভাবিক জঙ্গলে পরিদর্শন।
- বিভিন্ন উচ্চতার সহজলভ্য গাছের তালিকা তৈরি করা।

- এলাকায় সহজলভ্য স্থানীয় প্রজাতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া।
- স্থানীয় নার্সারীর সঙ্গে যোগাযোগ করা।

লেয়ার বা স্তর তৈরির জন্য এক্ষেত্রে উচ্চতা অনুযায়ী বিভিন্ন গাছ নির্বাচন করতে হয়।

বিভিন্ন উচ্চতার চার ধরনের গাছঃ

- গুল্ম (২-৬ মিটার)
- সাব ট্রি (৬-১৫ মিটার)
- ট্রি (১৫-৩৫ মিটার)
- ক্যানোপি (৩৫ মিটারের বেশি)

রোপণের আগে চারাগুলো ঢিপিতে বসিয়ে প্রতিটি গ্রুপে বিভিন্ন উচ্চতার গাছের বিন্যাস দেখে নিতে হয়।

৬) লেয়ার তৈরির জন্য চারা রোপণের পদ্ধতি

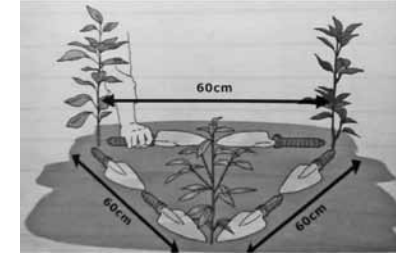

প্রতিটি ১০০ বর্গমিটারের ঢিপিকে প্রতি বর্গমিটারের ১০০টি গ্রুপে ভাগ করে তাতে গর্ত করে বিভিন্ন উচ্চতার বিভিন্ন ধরনের গাছ (কোথাও প্রতি গ্রুপে ৩টি/কোথাও ৪টি) রোপণ করতে হবে। চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৬০ সেমি.।

মিয়াওয়াকি জঙ্গলে উচ্চতা অনুযায়ী বিভিন্ন গাছের অনুপাত সাধারণত এমন হলে ভাল হয়ঃ

- গুল্মের স্তর ৮-১২%
- সাব ট্রি লেয়ার/স্তর ২৫-৩০%
- গাছের স্তর ৪০-৫০%
- ক্যানোপি লেয়ার/স্তর ১৫-২০%

৭) রোপণ পরবর্তী কাজ

ক) মালচিং – চারা রোপণের পর ধানের খড়/গমের খড়/যবের বৃন্ত বা ভূট্টার বৃন্তের সাহায্যে ৫-৭ ইঞ্চি পুরু করে মাটি ঢেকে দিতে হবে। তারপর চারার মাঝে মাঝে বাঁশের খুঁটি পুঁতে মাটির উপরকার মালচিং চেপে খুঁটিগুলোকে পাটের দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হয়। এতে জোরে হাওয়া দিলেও মালচিং সরে যাবে না।

খ) চারা সোজা রাখতে – মালচিং হয়ে গেলে চারার সামান্য দূরে বাঁশের কঞ্চি/কাঠি পুঁতে পাটের সরু দড়ি দিয়ে তার সঙ্গে চারাটিকে হালকা করে বেঁধে দিতে হবে। কঞ্চির উচ্চতা যেন চারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। চারা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়লে সেখানে লম্বা কঞ্চি/কাঠি ব্যবহার করতে হয়।

৮) জলসেচ

প্রথম অবস্থায় প্রতিদিন জঙ্গলে ১ ঘণ্টা জলসেচের প্রয়োজন হয়। মালচিং-এর উপরেই জলসেচ দিতে হয়। ঢিপির প্রতি বর্গমিটারে ৫ লিটার জল লাগে। অর্থাৎ ১০০ বর্গমিটার জায়গার জন্য ৫০০ লিটার জলের প্রয়োজন হবে।

জলসেচের সময়ে ঝাঁঝরি ছাড়া হোসপাইপ ব্যবহার করা যাবে না।

হোসপাইপের মুখে ঝাঁঝরি লাগিয়ে সেচ দিতে হবে।

৯) নিকাশি ব্যবস্থা

উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। জঙ্গলে যাতে কোনওভাবে জল জমতে না পারে।

ঢিপিতে কোনও নীচু জায়গা বা গর্ত থাকা চলবে না।

ঢিপিতে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা।

১০) দেখভাল

রোপণের পর ২-৩ বছর সময়কাল পর্যন্ত এই জঙ্গলে পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। ১-২ মাস অন্তর এই প্রক্রিয়া চালাতে হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য করণীয়;-

- প্রতি ঢিপির মরে যাওয়া চারা চিহ্নিত করা
- মৃত চারা তুলে নতুন চারা রোপণ করা
- কখনই গাছের ডাল ছাঁটাই করা যাবে না
- জঙ্গলের মাটি থেকে শুকনো পাতা ও ডালপালা তোলা চলবে না
- গাছে বা মাটিতে কোনও রাসায়নিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকা

সহজে ভেষজ উদ্ভিদ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরনঃ (১) বোর্ড, ডাস্টার, চক, বোর্ড পেন (২) কিছু ভেষজ উদ্ভিদ

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৪ ঘন্টা

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে আলোচনার শুরু	১৫ মিনিট
২)	ভেষজ উদ্ভিদ-এর ভূমিকা এবং চাষের যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচনা	৩০ মিনিট
৩)	ভিডিও প্রদর্শণ – ভেষজ উদ্ভিদ চাষ করে ভাগ্য বদলেছে..... mp4	০৫ মিনিট
৪)	প্রদর্শিত ভিডিও নিয়ে আলোচনা	১৫ মিনিট
৫)	প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
৬)	কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ভেষজ উদ্ভিদের চিত্র প্রদর্শণ "Herbal Tree.ppt"	২০ মিনিট
৭)	ঘরোয়া ভেষজ উদ্ভিদ বাগান, সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, বহুমুখী ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিফলেট বিতরণ	১০ মিনিট
৮)	ঘরোয়া ভেষজ উদ্ভিদ বাগান, সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, বহুমুখী ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা	২০ মিনিট
৯)	"Some Herbal Trees.pdf" নামক লিফলেট বিতরণ ও আলোচনা	১০ মিনিট
১০)	আলোচিত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
১১)	"দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বাস্থ্য রক্ষায় পারিবারিক ভেষজ বাগান" নিয়ে আলোচনা ও লিফলেট বিতরণ	৩০ মিনিট
১২)	ভিডিও প্রদর্শণ – "Herbs and its Utility.mp4" ও আলোচনা	১৫ মিনিট
১৩)	ভেষজ উদ্ভিদের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা	১৫ মিনিট
১৪)	ভিডিও প্রদর্শণ – "অলৌকিক গাছ সজিনা পাতার বিস্ময়কর গুণ.mp4" ও আলোচনা	১৫ মিনিট
১৫)	"ভেষজ উদ্ভিদের উপকারিতা" নামক লিফলেট বিতরণ ও আলোচনা	১০ মিনিট

ঘরোয়া ভেষজ উদ্ভিদ বাগান, সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, বহুমুখী ব্যবহার ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ঘরোয়া ভেষজ বাগান তৈরিঃ

ভারতের প্রতিটি গ্রাম্য পরিবারের প্রাথমিক, সাধারণ স্বাস্থ্য পরিবারের মহিলাদের বিশেষ করে বয়স্ক মহিলাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রতি পরিবারে একটি করে ঘরোয়া ভেষজ বাগান তৈরি করা প্রয়োজন যা ভেষজ উদ্ভিদের পুনরুজ্জীবন ও স্থানীয় প্রক্রিয়ায় তার ব্যবহার সুনিশ্চিত করবে। ঘরোয়া ভেষজ বাগান আমাদের সাধারণ অসুখ-বিসুখে ভেষজের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি পরিবেশকে সুন্দর ও সুস্থ রাখতে অনেকাংশে সাহায্য করে। রোগ-ব্যাধি সারানোর সাথে সাথে এই সব ভেষজ শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে তোলে। সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য প্রতি দিন এক জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কমপক্ষে তিনশো গ্রাম ভেষজ গুণসম্পন্ন শাক-সবজি খাওয়া উচিত।

ঘরোয়া ভেষজ বাগান তৈরির জন্য যে বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার সেগুলো হল-

১) জমি নির্বাচন

২) জমি তৈরি

৩) বীজ নির্বাচন ও বীজতলা তৈরি

৪) ভেষজ উদ্ভিদ নির্বাচন

৫) রোগ ও পোকা দমন

সাধারণত ঘরোয়া ভেষজ বাগানে উদ্ভিদকে পোকা মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করে ঘরোয়া পদ্ধতি ব্যবহার করাই ভালো। তাই প্রয়োজনে সকালে এই সব গাছের পাতায় একটু উনুনের ছাই ছড়িয়ে দিলে পিঁপড়ে বা অন্য পোকা মাকড় ধরে না। পোকা-মাকড় ধরা গাছে বাসক পাতা অথবা বনতামাক অথবা নিম বা নিসিন্দা সিদ্ধ জলে সাবান বা রিঠা ভেজানো জল মিশিয়ে গাছে ছিটিয়ে দিয়ে রোগ-পোকা দমন করা যায়। রোগ-পোকা দমনের ক্ষেত্রে কর্পূর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কর্পূর জলে গুলে ছড়িয়ে দিয়েও গাছের রোগ-পোকা দমন করা যায়।

উৎপাদিত ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ ও গুদামজাতকরণঃ

ভেষজ উদ্ভিদ উৎপাদন করার পর তাকে ঠিক সময়ে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ বা গুদামজাত না করলে তার ভেষজ গুণ ঠিকমতো থাকে না বা কার্যকরী হয় না। তাই অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ বিষয়ে বিশেষ বিধি মেনে চলার বিধান রয়েছে। ভেষজ সংগ্রহ পদ্ধতি ও সংরক্ষণ ঔষধি দ্রব্য বা ভেষজ নতুন ও পরিপুষ্ট হতে হবে। পোকামাকড় দ্বারা নষ্ট হয় নাই এমন। যে ঋতুতে যেই ফুল-ফল উৎপাদন হয় তা ওই ঋতুতেই ব্যবহার করতে হবে। উদ্ভিদ যখন ফুলে-ফলে সুশোভিত থাকে ওই অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে। শীত ও গ্রীষ্মকালে উদ্ভিদের মূল সংগ্রহ করতে হবে। বসন্তকালে পাতা সংগ্রহ করতে হয়। শরৎকালে উদ্ভিদের ছাল, কন্দ এর ক্ষীর সংগ্রহ করতে হয়। হেমন্তকালে

গাছের কাষ্ঠল বা সার সংগ্রহ করতে হয়। যেই ঋতুতে যেই ফুল-ফল জন্মে ওই ঋতুতেই তা সংগ্রহ করতে হয়। উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে যে যে অংশ ঔষধি গুণসম্পন্ন যেমন- পাতা, ফুল, ফল, ছাল, মূল ইত্যাদি উদ্ভিদের অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা করে ভালোভাবে পরিষ্কার করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া যেমন-শতমূলী, ঘৃতকুমারী, ওলটকম্বল, চাল কুমড়া ইত্যাদি বিশেষ পদ্ধতিতে শুকিয়ে নিতে হবে। যেন ভেষজগুলো পচন না ধরে, বিশ্রী গন্ধ না হয়ে যায় বা বদ রঙ না হতে পারে এমনভাবে শুকাতে হবে। যেভাবে চা-পাতা প্রসেস করা হয়। ওই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। (উষ্ণ বাতাস) কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোদে শুকানো যেতে পারে। বীজের ক্ষেত্রে রোদে শুকানো উত্তম।শুষ্ক ভেষজগুলো গুদামজাত করার জন্য উন্নত পলিথিন, চট, প্লাস্টিক, স্টিলের ড্রাম, বস্তা ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রেই শুষ্ক হতে হবে। যে গুদাম রাখা হবে তার ভেতর যেন বদ্ধ, গুমট হাওয়াযুক্ত না হয়। বাতাস যেমন চলাচল করতে পারে এমন গুদাম হতে হবে। পুরাতন স্যাঁতস্যাঁতে বদ্ধ ভবনে কখনও এসব ভেষজ রাখার স্থান নির্বাচন করা যাবে না। যেসব ভেষজ কাঁচাই ব্যবহার করতে হয় ওই ক্ষেত্রে হিমায়িত কক্ষ ব্যবহার করতে হবে। প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকা লতা, পাতা, গুল্ম, বৃক্ষ ইত্যাদিতে ভরপুর চির শ্যামল এ বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ভিদের কমতি নেই। এখানে যেমন ঔষধি ভেষজ আছে প্রচুর তেমনি চাহিদাও রয়েছে প্রচুর। অতএব, ভেষজ উদ্ভিদের চাষ করে আর্থিক আয়ের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হন, দারিদ্র্য দূর করুন এবং মানবসেবায় অবদান রাখুন। প্রকৃতির দেয়া দানকে কাজে লাগান।

ভেষজ উদ্ভিদের বহুমুখী ব্যবহারঃ

এমন কিছু ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে যেগুলো থেকে ওষুধ ছাড়াও ভেষজ কীটনাশক তৈরি করা সম্ভব যেমন- মেহগনি গাছের ফল এবং নিম থেকে তৈরি অত্যন্ত কার্যকর ভেষজ কীটনাশক ব্যবহার করে আমরা একদিকে যেমন কীটনাশক আমদানি ব্যয় হ্রাস করতে পারি তেমনি পরিবেশ রক্ষায় ও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।ওষুধ ও প্রসাধনী সামগ্রীর বাইরে আমাদের দেশে এমন অনেক উদ্ভিদ আছে, যা থেকে মূল্যবান ঔষধিগুণসম্পন্ন পরিপূরক খাদ্য তৈরি করা সম্ভব। উদারহরণ হিসেবে 'পানিফল' বা 'সিঙ্গাড়া' ফলের কথা বলা যায়। নিতান্ত অবহেলায় পরিত্যক্ত জলাশয়ে জন্ম নেয়া এই ফলের রয়েছে অসামান্য পুষ্টিগুণ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পানিফলকে বলবর্ধক ও যৌবনদায়ী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেয় বিপুল পরিমাণ কেওড়া ফল, যা' যথেষ্ট ভিটামিন ও পুষ্টিসমৃদ্ধ।

বিকল্প শিশুখাদ্য হিসেবে আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে শটিমূলের ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রাকৃতিকভাবে জন্ম নেয়া শটিগাছের মূল থেকে এ খাদ্য সংগ্রহ করা হয়, যা প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থসমৃদ্ধ। শটিমূল শোধন করে তা পাউডার আকারে টিন অথবা প্যাকেটজাত অবস্থায় বাজারজাত করা সম্ভব। এর ফলে একদিকে যেমন শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষা হবে অপরদিকে ক্ষতিকারক টিনজাত দুধ আমদানি হ্রাস পাবে। শটিচাষ অত্যন্ত লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত প্রচার ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে কৃষকরা আগ্রহী হয়ে উঠছে না। এসব অবহেলিত ফল-উদ্ভিদ প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাত করতে পারলে আমাদের কৃষিবাণিজ্যে নতুন মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে।

ভেষজ উদ্ভিদ চাষের অর্থনৈতিক গুরুত্বঃ

ভেষজ উদ্ভিদ চাষ অন্য যেকোনো ফসল চাষের চেয়ে বহুগুণ বেশি লাভজনক এবং নিরাপদ। সমগ্র বিশ্বে ভেষজ উদ্ভিদের বিপুল চাহিদা রয়েছে। ভেষজ উদ্ভিদ রপ্তানি করে চীন প্রতি বছর আয় করে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ভারত আয় করে ৬ বিলিয়ন ডলার এবং দক্ষিণ কোরিয়ার আয় ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। শতভাগ রপ্তানি সম্ভাবনা ছাড়াও ভেষজ উদ্ভিদের চাষ করে কৃষক তুলনামূলক অধিক লাভ করতে পারেন। অধিকাংশ ভেষজ উদ্ভিদের চাষ প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ। ভেষজ উদ্ভিদ চাষের ক্ষেত্রে সার ও কীটনাশকের ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ, এ

কারণে কৃষকের উৎপাদন খরচ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। গুল্মজাতীয় ভেষজ প্রায় বিনা পরিচর্যা ও বিনা খরচে উৎপাদন সম্ভব, অথচ এসব উদ্ভিদের বাজারদর বেশ চড়া।

দারিদ্র বিমোচন ও স্বাস্থ্য রক্ষায় পারিবারিক ভেষজ বাগান

আমাদের দেশে প্রচুর লতা-গুল্মজাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে, যা গ্রামেগঞ্জে, পতিত জমিতে বিনা পরিচর্যায় জন্মায়। আমরা যদি পরিকল্পিতভাবে অতি প্রয়োজনীয় এবং সহজলভ্য ভেষজ উদ্ভিদের পারিবারিক বাগান গড়ে তুলতে পারি, তবে একদিকে যেমন আমরা ছোটোখাট রোগব্যাধিতে বিনা পয়সায় ওষুধ পাব তেমনি এসব ভেষজ বাগান পরিবারে বাড়তি অর্থের জোগান দিতে পারে। পারিবারিক পর্যায়ে ভেষজ বাগান গড়ে তুলতে বিশেষ কোনো যত্ন বা ব্যয়ের প্রয়োজন নেই, বাড়ির আনাচে-কানাচে এবং পরিত্যক্ত জমিতে অনায়াসেই এসব উদ্ভিদের চাষ করা যায়। বাড়ির নারী সদস্যরাই এসব বাগান পরিচর্যা করতে পারেন। ভেষজ উদ্ভিদ চাষে যেহেতু তেমন কোনো সার বা কীটনাশক প্রয়োজন হয় না। তাই এই ধরণের বাগান প্রস্তুতিতে ব্যয় খুবই কম। এভাবে কৃষক পর্যায়ে প্রতিটি বাড়িতে গড়ে ওঠা ভেষজ বাগান আমাদের ভেষজ কৃষিতে অনবদ্য অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশের নাটোরের আফাজ উদ্দিন (পাগলা আফাজ) এ ধরনের একটি সফল উদ্যোগ নিয়ে সমপ্রতি সরকারি স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। তিনি একক প্রচেষ্টায় নাটোরের লক্ষ্মীপুর, পিজ্জিপাড়া, ইব্রাহিমপুর, সোনাপুর, চানপুর, দক্ষিণপুর, দোয়াতপাড়া, সুলতানপুরসহ বেশ কিছু গ্রামজুড়ে গড়ে তুলেছেন দেশের একমাত্র 'ঔষধি গ্রাম'।

এভাবে 'ঔষধি গ্রাম' গড়ে তোলা সম্ভব হলে আমাদের দেশের কৃষি ক্ষেত্রে নব দিগন্ত সূচিত হতে পারে। ঔষধি গাছ শুধু মানুষেরই রোগ সারায় না, এটি পরিবেশ রক্ষা করে এবং বাতাসে ভাসমান নানা অদৃশ্য রোগজীবাণু ধ্বংসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই ব্যাপকভাবে ঔষধি বৃক্ষ চাষের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পরিবেশ রক্ষা দুটোই সম্ভব।

গ্রামপ্রধান এই দেশের লাখ লাখ মানুষ আজও গাছগাছড়া ও লতাগুল্ম থেকে ওষুধের ব্যবহারের মাধ্যমে নানারকম রোগব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে , বিশেষ করে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী। দেশের লোকসংখ্যার একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। সেখানে উচ্চমূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রশ্নই ওঠে না। নিকট অতীতেও আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ সাধারণ রোগবালাই নিরাময়ে ভেষজ গাছ-গাছড়া তথা দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। খেয়াল করলেই দেখতে পাই চারপাশের গাছ-গাছড়া, লতাগুল্মের মধ্যে কোনো না কোনো ঔষধি গুণ রয়েছে। ভেষজ উদ্ভিদ এর মাধ্যমে তৈরিকৃত ওষুধ আদিকাল থেকে মানব সমাজ ব্যবহার করে রোগব্যাধি মুক্ত হচ্ছে। তাইতো রাস্তাঘাটে শেকড়-বাকল বিক্রি হলে মানুষের ভিড় জমে। সারা বিশ্বে আজ পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যার যত চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবিত ও প্রচলিত রয়েছে তার প্রতিটিরই বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে ভেষজ উদ্ভিদ। বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক স্বীকৃত আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, যা অ্যালোপ্যাথিক নামে খ্যাত। এ চিকিৎসা পদ্ধতির বহু ওষুধ আসে উদ্ভিদ থেকে। নয়নতারা ও ক্যাকটাস উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত ক্যানসার চিকিৎসার ওষুধ ক্যামোথেরাপিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আজ ভারতীয় উপমহাদেশের সবক'টি দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে হোমিওপ্যাথিক, যার অধিকাংশ ওষুধ আসে ভেষজ উদ্ভিদ থেকে। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ যতদিন বাঁচবে ততদিন গাছগাছড়া, লতাগুল্মের ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। ভেষজ ঔষধি গাছ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ামুক্ত, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী, ভেষজ ওষুধে রোগ পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। এ কারণে বিশ্বব্যাপী ভেষজ উদ্ভিদের উৎপাদন ও ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বৃক্ষরোপণ ও সামাজিক বনায়ন, সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচনের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে। তেমনি ঔষধি গাছ উৎপাদনের মাধ্যমেও দারিদ্র্যবিমোচন সম্ভব। তবে তা হবে পরিকল্পিত বাগান স্থাপন। প্রয়োজনমতো ভেষজ উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে আর্থিক আয়। এলাকাভিত্তিক সহজলভ্য গাছ নির্বাচন করতে হবে, যাতে সহজেই বিপণন করা যায়। বাগানে কিছু বড় বড় ঔষধি গাছ ছাড়াও ছোট ও লতাগুল্ম গাছ

লাগালে ভালো হবে। যেমন- অর্জুন, আমলকী, বহেরা, হরীতকী, বেল, সজিনা, শিমুল, ছাতিম, তেজপাতা, পলাশ, তুত, চম্পাফুল, গর্জন, অশ্বত্থ, চালতা, এলাচি, দারুচিনি, করমচা, নিম,নিশিন্দা, তাল, জামির,ডুমুর এবং লতা জাতীয় তুলসী, থানকুনি, বসাক, কালোমেঘ, ঘৃতকুমারী, পাটশাক, তেলাকুচা, শতমূল, সর্পগন্ধা, লজ্জাবতী, মেহেদি, আদা, ভেরেন্ডা ও হেলেঞ্চা ইত্যাদি। বড় গাছগুলো একটি থেকে আরেকটি ৫ মিটার দূরে লাগাতে হবে। লতা জাতীয় গাছ মাচা দিয়ে কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় লাগালেই হবে। চাষের জন্য সঠিক প্রাকৃতিক পরিবেশে জৈব সার প্রয়োগ করে ঔষধি গাছের উৎপাদন করতে হবে। তা না হলে ঔষধি গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে। সেজন্য মাটির উর্বরতা, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, সেচ, সার ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে।

কিছু কিছু ভেষজ গাছের উল্লেখযোগ্য উপকারিতা

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে। কিন্তু কোন উদ্ভিদে কি গুন তা আমরা সবাই জানি না। প্রত্যেকটি ভেষজ উদ্ভিদেরই কিছু না কিছু ঔষধী গুন রয়েছে। ঔষুধ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদা সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইউনানি, আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি ওষুধ উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি বিউটি পার্লার ও প্রসাধনীতে এখন প্রচুর ভেষজ উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে।

নীচে কিছু ভেজষ উদ্ভিদের ঔষধী গুনাগন তুলে ধরা হলোঃ

বাসকঃ

বাসক একটি ভারত উপমহাদেশীয় ভেষজ উদ্ভিদ। আর্দ্র, সমতলভূমিতে এটি বেশী জন্মে। লোকালয়ের কাছেই জন্মে বেশী। হালকা হলুদে রংয়ের ডালপালাযুক্ত ১ থেকে ২ মি. উঁচু গাছ, ঋতুভেদে সর্ব্বদাই প্রায় সবুজ থাকে। বল্লমাকারের পাতা বেশ বড়। ফুল ঘন, ছোট স্পাইকের ওপর ফোটে। স্পাইকের বৃন্ত পাতার চেয়ে ছোট। স্পাইকের ওপর পাতার আকারে উপপত্র থাকে যার গায়ে ঘন এবং মোটা শিরা থাকে। ফুলের দল (কোরোল্লা বা পত্রমূলাবর্ত) সাদা বর্ণ। তার ওপর বেগুনী দাগ থাকে। ফল সুপারি আকৃতির বীজে ভর্তি।

ঔষধী গুণঃ

তাজা অথবা শুকানো পাতা ওষুধের কাজে লাগে। বাসকের পাতায় "ভাসিসিন" নামীর ক্ষারীয় পদার্থ এবং তেল থাকে। শ্বাসনালীর লালাগ্রন্থিকে সক্রিয় করে বলে বাসক শ্লেষ্মানাশক হিসেবে প্রসিদ্ধ । বাসক পাতার নির্যাস, রস বা সিরাপ শ্লেষ্মা তরল করে নির্গমে সুবিধা ক'রে দেয় বলে সর্দি, কাশি এবং শ্বাসনালীর প্রদাহমূলক ব্যাধিতে বিশেষ উপকারী। তবে অধিক মাত্রায় খেলে বমি হয়, অন্তত: বমির ভাব বা নসিয়া হয়, অস্বস্তি হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বাসকের ভেষজ গুণাবলি প্রমাণিত হয়েছে। এর মূল, পাতা, ফুল, ছাল সবই ব্যবহার হয়।

প্রয়োগঃ

১। বাসক পাতার রস ১-২ চামচ হাফ থেকে এক চামচ মধুসহ খেলে শিশুর সদির্কাশি উপকার পাওয়া যায়।

২। বাসক পাতার রস স্নানের আধ ঘন্টা আগে মাথায় কয়েকদিন মাখলে উকুন মরে যায়। আমবাত ও ব্রণশোথে (ফোঁড়ার প্রাথমিক অবস্থা) বাসক পাতা বেটে প্রলেপ দিলে ফোলা ও ব্যথা কমে যায়।

৩। যদি বুকে কফ জমে থাকে এবং তার জন্যে শ্বাসকষ্ট হলে বা কাশি হলে বাসক পাতার রস ১-২ চামচ

এবং কন্টিকারীরস ১-২ চামচ, ১ চামচ মধুসহ খেলে কফ সহজে বেরিয়ে আসে।

৪। প্রস্রাবে জ্বালা-যন্ত্রনা থাকলে বাসকের ফুল বেটে ২-৩ চামচ মিছরি ১-২ চামচ সরবত করে খেলে এই রোগে উপকার পাওয়া যায়।

৫। জ্বর হলে বা অল্প জ্বর থাকলে বাসকের মূল ৫-১০ গ্রাম ধুয়ে থেঁতো করে ১০০ মিলি লিটার জলে ফোটাতে হবে।

৬। ২৫ মিলি লিটার থাকতে নামিয়ে তা ছেঁকে নিয়ে দিনে ২ বার করে খেলে জ্বর এবং কাশি দুইই চলে যায়।

৭। বাসকের কচিপাতা ১০-১২ টি এক টুকরো হলুদ একসঙ্গে বেটে দাদ বা চুলকানিতে লাগলে কয়েকদিনের মধ্যে তা সেরে যায়।

৮। বাসকপাতা বা ফুলের রস ১-২ চামচ মধু বা চিনি ১চামচসহ প্রতিদিন খেলে জন্ডিস রেগে উপকার পাওয়া যায়।

৯। পাইরিয়া বা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়লে বাসক পাতা ২০ টি থেঁতো করে ২ কাপ জলে সিদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে নামিয়ে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় কুলকুচি করলে এই রোগে উপকার পাওয়া যায়।

১০।শিশুর পেটে কৃমি থাকলে বাসকের ছালের ক্বাথ খাওয়ালে এর উগ্র তিক্ত স্বাদ কৃমি বের হয়ে যায়।

১১। যাদের হাঁপানির টান আছে তারা বাসক পাতা শুকনো করে, ওই পাতা বিড়ি বা চুরুটের মতো পাকিয়ে এর সাহায্যে ধূমপান করলে শ্বাসকষ্ট প্রশমিত হয়।

১২।যাদের গায়ে ঘামের গন্ধ হয় তারা বাসক পাতার রস গায়ে লাগালে দুর্গন্ধ দূর হবে।

১৩।বাসকপাতার রস ও শঙ্খচূর্ণ মিশিয়ে নিয়মিত ব্যবহার করলে রং ফরসা হবে।

১৪।এক কলসি পানিতে তিন-চারটি বাসকপাতা ফেলে তিন-চার ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখার পর সেই পানি বিশুদ্ধ হয়ে যায়। এরপর ব্যবহার করতে পারেন।

১৫।পাতার রস নিয়মিত খেলে খিঁচুনি রোগ দূর হয়ে যায়।

১৬।বাসক পাতার রস মাথায় লাগালের উকুন চলে যায়।

১৭।বাসক পাতা বা ফুলের রস এক বা দুই চামচ মধু বা চিনি দিয়ে খেলে জন্ডিস ভালো হয়।

১৮।শরীরে দাদ থাকলে বাসক পাতার রস লাগালে ভালো হয়ে যায়।

অন্যান্য উপকারিতাঃ

বাসকের পাতা সবুজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পাতা থেকে হলদে রং পাওয়া যায়। বাসক পাতায় এমন কিছু ক্ষারীয় পদার্থ আছে যায় ফলে ছত্রাক জন্মায় না এবং পোকামাকড় ধরে না বলে ফল প্যাকিং এবং সংরক্ষণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। পাতায় কিছু দুর্গন্ধ আছে বলে পশুরা মুখ দেয় না। সেই কারণে চাষ আবাদের জন্য জমি উদ্ধারের কাজে বাসকের পাতা বিশেষ উপকারী।

তেলাকুচাঃ

তেলাকুচা একপ্রকারের ভেষজ উদ্ভিদ। বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে একে 'কুচিলা', তেলা, তেলাকচু, তেলাহচি, তেলাচোরা কেলাকচু, তেলাকুচা বিম্বী ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। অনেক অঞ্চলে এটি সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। গাছটির ভেষজ ব্যবহারের জন্য এর পাতা, লতা, মূল ও ফল ব্যবহৃত হয়। এটি লতানো উদ্ভিদ। এটি গাঢ় সবুজ রঙের নরম পাতা ও কাণ্ডবিশিষ্ট একটি লতাজাতীয় বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। লতার কাণ্ড থেকে আকশীর সাহায্যে অন্য গাছকে জড়িয়ে উপরে উঠে। পঞ্চভূজ আকারের পাতা গজায়, পাতা ও লতার রং সবুজ। এর ফল ও কচি ডগা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেখানে। তেলাকুচায় প্রচুর বিটা-ক্যারোটিন আছে।

তেলাকুচা ফলে আছে 'মাস্ট সেল স্টেবিলাইজিং', 'এনাফাইলেকটিক-রোধী' এবং 'এন্টিহিস্টামিন' জাতীয় উপাদান। কবিরাজী চিকিৎসায় তেলাকুচা বেশ কিছু রোগে ব্যবহৃত হয়, যেমন- কুষ্ঠ, জ্বর, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, ব্রংকাইটিস ও জন্ডিস।

কালমেঘঃ

কালমেঘ একটি ভেষজ উদ্ভিদ। ১ সে.মি. লম্বা ফুলের রং গোলাপী। ফল দেড় থেকে দু সে.মি. লম্বা। শিকড় ব্যতীত কালমেঘ গাছটির সব অংশই ঔষুধের কাজে লাগে। কালমেঘ অত্যন্ত তেতো এবং পুষ্টিকর। মানব দেহের রোগপ্রতিরোধী শক্তি বৃদ্ধি করে। জ্বর, কৃমি, আমাশয়, সাধারণ শারীরিক দুর্বলতা এবং বায়ু আধিক্যে কালমেঘ অত্যন্ত উপকারী।

শিশুদের যকৃৎ রোগে এবং হজমের সমস্যায় কালমেঘ ফলপ্রদ। কালমেঘের পাতা থেকে তৈরী আলুই পশ্চিম বাংলার ঘরোয়া ঔষুধ যা পেটের অসুখে শিশুদের দেওয়া হয়। টাইফয়েড রোগে এবং জীবানুরোধে কালমেঘ কার্যকরী। সাধারণ একটা বিশ্বাস ছিল যে সাপের কামড়ে কালমেঘ খুব উপকারী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কথাটা ভুল। কোথাও কোথাও কালমেঘ গাছ বেটে সরষের তেলে চুবিয়ে নিয়ে চুলকানিতে লাগানো হয়। গাছের পাতার রস কোষ্ঠকাঠিন্য ও লিভার রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

কালমেঘ গাছের পাতার রস জ্বর, কৃমি, অজীর্ণ, লিভার প্রভৃতি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে পাতার রস মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। জানা যায় যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা শিশুদের বদহজম ও লিভারের সমস্যায় প্রাচীনকাল থেকে এটি ব্যবহার করছে। এ গাছের রস রক্ত পরিষ্কারক, পাকস্থলী ও যকৃতের শক্তিবর্ধক ও রেচক হিসেবেও কাজ করে। আবার এ গাছের পাতা সিদ্ধ করে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে ঘা-পাঁচড়া জাতীয় রোগ দূর হয় বলে আদিবাসীদের বিশ্বাস।

অর্জুনঃ

ভেষজশাত্রে ঔষধি গাছ হিসাবে আর্জুনের ব্যবহার অগনিত।বলা হয়ে থাকে, বাড়িতে একটি অর্জুন গাছ থাকা আর এক জন ডাক্তার থাকা একই কথা।এর ঔষধি গুন মানবসমাজের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে সুপ্রাচীন কাল

থেকেই।শরীরের বল ফিরিয়ে আনা এবং রণাঙ্গনে মনকে উজ্জীবিত রাখতে অর্জুন ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে মহাভারত ও বেদ-সংহিতায়।তার পর যত দিন যাচ্ছে ততই অর্জুনের উপকারী দিক উদ্ভাবিত হচ্ছে।

১। যাদের বুক ধড়ফড় করে অথচ উচ্চ রাক্তচাপ নাই, তাদের পক্ষে অর্জুন ছাল কাঁচা হলে ১০-১২ গ্রাম, শুকনা হলে ৫-৬ গ্রাম একটু ছেঁচে ২৫০ মিলি দুধ ও ৫০০ মি লি জল এর সাথে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে আনুমানিক ১২৫ মিলি থাকতে ছেঁকে বিকেলবেলা খেলে বুক ধড়ফড়ানি কমে যায়। তবে পেটে যাতে বায়ু না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২। অর্জুন ছাল বেটে খেলে হৃৎপিন্ডের পেশি শক্তিশালী হয়, হৃৎপিন্ডের ক্ষমতা বাড়ে।এটি রক্তের কোলেষ্টরল কমায় এবং ফলত রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে থাকে।

৩। বিচুর্ণ ফল মূত্রবর্ধক হিসেবে কাজ করে এবং লিভারসিরোসিসের টনিক হিসাবে ব্যাবহৃত হয়।

৪। অর্জুনের ছালে ট্যানিন রয়েছে, এ টানিন মুখ,জিহ্বা ও মাড়ীর প্রদাহের চিকিৎসায় ব্যাবহার হয়। এটি মাড়ীর রক্তপাত বন্ধ করে এবং শরীরে ক্ষত, খোস পাঁচড়া দেখা দিলে অর্জুনের ছাল বেটে লাগালে সেরে যায়।

৫। অর্জুনের ছাল হাঁপানি, আমাশয়, ঋতুস্রাবজনিত সমস্যা, ব্যথ্যা ,প্রদর ইত্যাদি চিকিৎসায়ও উপকারী।

৬। এটি সংকোচ ও জ্বর নিবারক হিসাবেও কাজ করে।

৭। এ ছাড়া অর্জুনে saponin রয়েছে, একটি যৌন উদ্দীপনা বাড়ায়। তাই চর্ম ও যৌন রোগে অর্জুন ব্যাবহৃত হয়। যৌন উদ্দীপনা বাড়াতেও অর্জুনের ছালের রস ব্যাবহার হয়।

৮। অর্জুনের ছালে essential oil রয়েছে তাই অর্জুন খাদ্যা হজম ক্ষমতা বাড়ায়। খাদ্যাতন্ত্রের ক্রিয়া স্বভাবিক রাখতে সাহায্য করে।

৯। ক্যান্সার কোষের বর্ধন রোধকারী gallic acid, ethy gallae ও lutenolin রয়েছে অর্জুন ছালে। এ কারনে এটি ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যাহারের সুযোগ রয়েছে।

অশ্বগন্ধাঃ

অশ্বগন্ধা আমাদের দেশের ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে অন্যতম। গাছের গন্ধ ঘোড়া বা অশ্ব এর মত বলেই সংস্কৃতে একে অশ্বগন্ধা বলে। বাংলায় ও আমার অশ্বগন্ধা-ই বলে থাকি। শক্তিবর্ধক হিসেবে এবং এ্যাফ্রোডেসিয়াক হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলেই ইংরেজিতে একে Indian Ginseng বলে। মূল এবং পাতা স্নায়ুর বিভিন্ন রোগে ব্যবহৃত হয়। এ গাছ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকায় পাওয়া যায়। নিদ্রা আনয়নকারী ঔষধ হিসেবে প্রচীন মেসোপটেমিয়া এবং মিশরে এর ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

তুলসীঃ

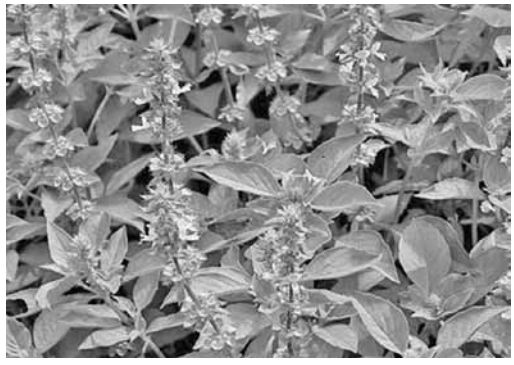

তুলসী একটি ঔষধিগাছ। তুলসী অর্থ যার তুলনা নেই। সুগন্ধিযুক্ত, কটু তিক্তরস, রুচিকর। এটি সর্দি, কাশি, কৃমি ও বায়ুনাশক এবং মুত্রকর, হজমকারক ও এন্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে বিশেষ করে কফের প্রাধান্যে যে সব রোগ সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রে তুলসী বেশ ফলদায়ক।

শিশুদের সর্দি কাশির জন্য এটি একটি মহা ঔষধ হলেও যে কোন বয়সের মানুষই এ থেকে উপকার পেয়ে থাকে। শুধু পুজো-অর্চনাতেই লাগে না। তুলসী পাতার অনেক গুণ রয়েছে।

ব্যবহার ও ঔষধি গুণাগুণঃ

১। জ্বর হলে জলের মধ্যে তুলসী পাতা, গোল মরিচ এবং মিশ্রী মিশিয়ে ভাল করে সেদ্ধ করুন। অথবা তিনটে দ্রব্য মিশিয়ে বড়ি তৈরি করুন। দিনের মধ্যে তিন-চার বার ঐ বড়িটা জলের সঙ্গে খান। জ্বর খুব তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

২। কাশি যদি না কমে সেই ক্ষেত্রে তুলসী পাতা এবং আদা পিষে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খান। এতে উপকার পাবেন।

৩। পেট খারাপ হলে তুলসীর ১০ টা পাতা সামান্য জিরের সঙ্গে পিষে ৩-৪ বার খান। খুব তাড়াতাড়ি নিরাময় হয়ে যাবে।

৪। মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে দিনে ৪-৫ বার তুলসী পাতা চেবান।

৫। ঘা যদি দ্রুত কমাতে চান তাহলে তুলসী পাতা এবং ফিটকিরি একসঙ্গে পিষে ঘা এর স্থানে লাগান, কমে যাবে।

৬। শরীরের কোন অংশ যদি পুড়ে যায় তাহলে তুলসীর রস এবং নারকেলের তেল ফেটিয়ে লাগান, এতে জ্বালা কমবে। পোড়া জায়গাটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। সেখানে কোন দাগ থাকবে না।

৬। ত্বকের চমক বাড়ানোর জন্য, এছাড়াও ত্বকের বলীরেখা এবং ব্রোন দূর করার জন্য তুলসী পাতা পিষে মুখে লাগান।

৭। বুদ্ধি এবং স্মরণশক্তি বাড়ানোর জন্য প্রতিদিন ৫-৭ টা তুলসী পাতা চিবান।

৮। প্রস্রাবে জ্বালা হলে তুলসী পাতার রস ২৫০ গ্রাম দুধ এবং ১৫০ গ্রাম জলের মধ্যে মিশিয়ে পান করুন। উপকার পাবেন

৯। ত্বকের সমস্যা দূর করতে তিল তেলের মধ্যে তুলসী পাতা ফেলে হালকা গরম করে ত্বকে লাগান।

১০।আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের সর্দি-কাশিতে তুলসী পাতার রস ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে কয়েকটি তাজা তুলসী পাতার রসের সাথে একটু আদার রস ও মধুসহ খাওয়ানো হয়। বাচ্চাদের সর্দি-কাশিতে এটি বিশেষ ফলপ্রদ। তাজা তুলসী পাতার রস মধু, আদা ও পিঁয়াজের রসের সাথে এক সাথে পান করলে সর্দি বের হয়ে যায় এবং হাপানিতে আরাম হয়।

১১। পেট কামড়ানো, কাশি: তুলসী পাতার রসে মধু মিশিয়ে খাওয়ালে বাচ্চাদের পেট কামড়ানো, কাশি ও

লিভার দোষে উপকার পাওয়া যায়।

১২। ঘামাচি ও চুলকানি: তুলসী পাতা ও দুর্বার ডগা বেটে গায়ে মাখলে ঘামাচি ও চুলকানি ভাল হয়।

দাদ ও অন্যান্য চর্মরোগে: স্থানীয়ভাবে তুলসী পাতার রস দাদ ও অন্যান্য চর্মরোগে ব্যবহার করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। পাতার রস ফোঁটা ফোঁটা করে কানে দিলে কানের ব্যথা সেরে যায়।

১৩।ম্যালেরিয়া: পাতা ও শিকড়ের ক্বাথ ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য বেশ উপকারী। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে প্রতিদিন সকালে গোল মরিচের সাথে তুলসী পাতার রস খেতে দেয়া হয়। যতদিন সম্ভব খাওয়া যায়।

১৪।বসন্ত, হাম: বসন্ত, হাম প্রভৃতির পুঁজ ঠিকমত বের না হলে তুলসী পাতার রস খেলে তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসবে।

১৫। ক্রিমি: তুলসী পাতার রসের সাথে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে ক্রিমি রোগে বেশ উপকার পাওয়া যায়। শুষ্ক তুলসী পাতার ক্বাথ সর্দি, স্বরভঙ্গ, বক্ষপ্রদাহ, উদারাময় প্রভৃতি রোগ নিরাময় করে থাকে।

১৬। পেট ব্যথা: অজীর্ণজনিত পেট ব্যথায় তুলসী পাতার বেশ উপকার সাধন করে থাকে। এটি হজমকারক। প্রতিদিন সকালে ১৮০ গ্রাম পরিমান তুলসী পাতার রস খেলে পুরাতন জ্বর, রক্তক্ষয়, আমাশয়, রক্ত অর্শ এবং অজীর্ণ রোগ সেরে যায়।

১৭।বাত ব্যথা: বাত ব্যথায় আক্রান্ত স্থানে তুলসী পাতার রসে ন্যাকড়া ভিজিয়ে পট্টি দিলে ব্যথা সেরে যায়।

১৮।কীট-পতঙ্গ কামড়ালে: বোলতা, ভীমরুল, বিছা প্রভৃতি বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ কামড়ালে ঐ স্থানে তুলসী পাতার রস গরম করে লাগালে জ্বালা-যন্ত্রণা কম হয়।

১৯।সর্দি: যারা সহজেই সর্দিতে আক্রান্ত হয় (বিশেষ করে শিশুদের) তারা কিছুদিন ৫ ফোঁটা মধুর সাথে ১০ ফোঁটা রস খেলে সর্দি প্রবণতা দূর হয়।

২০।তুলসী মূল শুক্র গাঢ়কারক এবং বাজীকারক। তুলসী পাতার ক্বাথ, এলাচ গুঁড়া এবং এক তোলা পরিমাণ মিছরী পান করলে ধাতুপুষ্টি সাধিত হয় যতদিন সম্ভব খাওয়া যায়। এটি অত্যন্ত ইন্দ্রিয় উত্তেজক। প্রতিদিন এক ইঞ্চি পরিমাণ তুলসী গাছের শিকড় পানের সাথে খেলে যৌনদূর্বলতা রোগ সেরে যায়।

২১।কোন কারনে রক্ত দূষিত হলে কাল তুলসিপাতার রস কিছুদিন খেলে উপকার পাওয়া যায়।শ্লেষ্মার জন্য নাক বন্ধ হয়ে কোনো গন্ধ পাওয়া না গেলে সে সময় শুষ্ক পাতা চূর্ণের নস্যি নিলে সেরে যায়। পাতাচূর্ণ দুই আঙ্গুলের চিমটি দিয়ে ধরে নাক দিয়ে টানতে হয়, সেটাই নস্যি। তুলসী পাতা দিয়ে চায়ের মত করে খেলে দীর্ঘদিন সুস্থ থাকা যায়। তুলসী চা হিসাবে এটি বেশ জনপ্রিয়।.

২২। তুলসিপাতার রসে লবন মিশিয়ে দাদে লাগালে উপশম হয়।

২৩।প্রস্রাবজনিত জ্বালা: তুলসীর বীজ পানিতে ভিজালে পিচ্ছিল হয়। এই পানিতে চিনি মিশিয়ে শরবতের মত করে খেলে প্রস্রাবজনিত জ্বালা যন্ত্রনায় বিশেষ উপকার হয়।

২৪।কালো দাগ: মুখে বসন্তের কাল দাগে তুলসীর রস মাখলে ঐ দাগ মিলিয়ে যায়। হামের পর যে সব শিশুর শরীরে কালো দাগ হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে তুলসী পাতার রস মাখলে গায়ে স্বাভাবিক রং ফিরে আসে।

চিরসবুজ বৃক্ষ হরীতকীঃ

হরীতকী মধ্যম থেকে বৃহদাকার চিরসবুজ বৃক্ষ। ত্রিফলার অন্যতম ফল হচ্ছে হরীতকী। হরীতকী গাছকে ভেষজ চিকিৎসকরা মায়ের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। তারা বলেন, মানুষের কাছে এ বৃক্ষ মায়ের মতোই আপন। মানুষের শরীরে সংক্রামিত প্রায় সব রোগ-ব্যাধির ওষুধ হিসেবে হরীতকীর ব্যবহার রয়েছে। অর্শরোগে, রক্তার্শে, চোখের রোগ, পিত্তবেদনা, গলার স্বর বসে যাওয়া, হৃদরোগ, বদহজম, আমাশয়, জন্ডিস, ঋতুস্রাবের ব্যথা, জ্বর, কাশি, হাঁপানি, পেটফাঁপা, ঢেঁকুর ওঠা, বর্ধিত যকৃত ও প্লীহা, বাতরোগ, মহৃত্রনালীর অসুখ, ফুসফুস, শ্বাসনালীঘটিত রোগে হরীতকী ফলের গুঁড়া ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ঘন ঘন পানির তৃষ্ণা কিংবা বমি বমিভাব কাটাতেও হরীতকী ব্যবহৃত হয়। ত্রিফলা অর্থাৎ আমলকী, বহেরা, হরীতকী_ এর প্রতিটির সমপরিমাণ গুঁড়ার শরবত কোলেস্টেরল অর্থাৎ প্রেসার বা রক্তচাপ কমানোর মহৌষধ। এক ওষুধ গবেষক দলের মতে, আধুনিক যে কোনো অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের তুলনায় ত্রিফলা কোলেস্টেরল কমানোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি ফলপ্রসহ্। তাদের মতে, দ্রব্যগুলোর দিক দিয়ে হরীতকীই সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় স্থানে আমলকী এবং তৃতীয় স্থানে বহেরা। ত্রিফলা শুধু কোলেস্টেরলই কমায় না বরং এতে প্লীহা ও যকৃতের উপকার হয়। এছাড়া হরীতকীর কাঠ আসবাবপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি ছাড়াও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। ফল থেকে ট্যানিন, লেখার কালি ও রং পাওয়া যায়।

নানা রোগ নিরাময়ে হরীতকী খুব উপকারীঃ

হরীতকী বললেই ত্রিফলার কথা আসে। ত্রিফলা মানে তিনটি ফলের সমাহার। এই তিনটি ফল হলো, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া। তবে তিনটি ফলের মধ্যে হরীতকীর রয়েছে অসাধারণ গুণ। ফলে পাক ধরলে হলুদাভ সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং চিবুলে তিতকুটে লাগে। ফলের কোনো কিছু ফেলনা নয়। বীজের ভেতরের শাঁসও মজা করে খাওয়া যায়। হরীতকী ভেষজ গুণসমৃদ্ধ। আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরিতে ত্রিফলা ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও কলেরা ও আমাশয় নিরাময়ে এর যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। হরীতকী চূর্ণ ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে পিত্তশূল দূর হয়। বিশেষভাবে পরিশোধনের মাধ্যমে। পাইলস, হাঁপানি, চর্ম, ক্ষত, কনজাংটিভাইটিস রোগেও হরীতকী ব্যবহৃত হয়। হরীতকীর কাঠ খুবই শক্ত এবং টেকসই। গৃহনির্মাণ এমনকি সুদৃশ্য আসবাবপত্র তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য গুণাগুণের কারণে বাংলার প্রায় প্রতিটি বাড়ির আঙিনায় নিমের পাশাপাশি মানুষ হরীতকীর গাছ লাগায়। এমনকি সরকারও বনায়ন কর্মসূচির আওতায় রাস্তার পাশে হরীতকী রোপণে মনোনিবেশ করেছে।

হরীতকীর গুণাবলিঃ

আয়ুর্বেদিক বিজ্ঞানে ত্রিফলা নামে পরিচিত তিনটি ফলের একটি হরীতকী। এর নানা গুণ আছে। স্বাদ তিতা। এটি ট্যানিন, অ্যামাইনো এসিড, ফ্রুকটোজ ও বিটা সাইটোস্টেরল-সমৃদ্ধ।

ব্যবহারঃ

হরীতকী দেহের অন্ত্র পরিষ্কার করে এবং একই সঙ্গে দেহের শক্তি বৃদ্ধি করে। এটা রক্তচাপ ও অন্ত্রের খিঁচুনি কমায়। হৃৎপিণ্ড ও অন্ত্রের অনিয়ম দূর করে। এটা রেচক, কষাকারক, পিচ্ছিলকারক,পরজীবীনাশক, পরিবর্তনসাধক, অন্ত্রের খিঁচুনি রোধক এবং স্নায়বিক শক্তিবর্ধক। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য, স্নায়বিক দুর্বলতা, অবসাদ এবং অধিক ওজনের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। হরীতকীতে অ্যানথ্রাকুইনোন থাকার কারণে রেচক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে

হরীতকী। অ্যালার্জি দূর করতে হরীতকী বিশেষ উপকারী। হরীতকী ফুটিয়ে সেই পানি খেলে অ্যালার্জি কমে যাবে। হরীতকীর গুঁড়া নারিকেল তেলের সঙ্গে ফুটিয়ে মাথায় লাগালে চুল ভালো থাকবে। হরীতকীর গুঁড়া পানিতে মিশিয়ে খেলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়বে। গলা ব্যথা বা মুখ ফুলে গেলে হরীতকী পানিতে ফুটিয়ে সেই পানি দিয়ে গার্গল করলে আরাম পাবেন। দাঁতে ব্যথা হলে হরীতকী গুঁড়া লাগান, ব্যথা দূর হবে। রাতে শোয়ার আগে অল্প বিট নুনের সঙ্গে ২ গ্রাম লবঙ্গ বা দারুচিনির সঙ্গে হরীতকীর গুঁড়া মিশিয়ে খান। পেট পরিষ্কার হবে।

বহেড়াঃ

বিভিন্ন রোগে প্রয়োগঃ

১। ইন্দ্রিয়-দোর্বল্যেঃ এ রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে রোজ দু'টি করে বহেড়া বিচীর শাঁস খান।

২। শ্বেতী রোগেঃ বহেড়া বিচির শাঁসের তেল বের করে শ্বেতীর ওপর লাগালে গায়ের রং অল্পদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক হবে।

৩। অকালে টাক পড়লেঃ বহেড়া বিচির শাঁস অল্প পানিতে মিহি করে বেটে চন্দনের মতো টাকে লাগালে, টাক সেরে যায়।

৪। শ্লেস্মায়ঃ আধা চা-চামচ বগেড়া চূর্ণ, ঘি গরম করে তার সাথে মিশিয়ে আবার গরম করে মধু মিশিয়ে চেটে খেলে উপরকার পাওয়া যায়।

৫। আমাশয়ঃ সাদা বা রক্ত যে কোনও আমাশয়ে প্রতিদিন সকালে পানির সাথে বহেড়া চূর্ণ খেলে উপকার পাওয়া যায়।

অকালে চুল পাকলেঃ বহেড়ার বিচি বাদ দিয়ে ১০ গ্রাম ছাল নিয়ে পানি দিয়ে বাটুন। এক কাপ পানিতে গুলে পানিতে ছেঁকে নিন, এবার সে পানি দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

৬। ফুলো কমানোর জন্যঃ বহেড়ার বিচি বাদ দিয়ে ছাল বেটে একটু গরম করে ফুলোয় প্রলেপ দিলে ফুলো কমে যাবে।

ভেষজ দাওয়াই

ব্যবহারঃ

বহেড়া বিশেষভাবে পরিশোধিত করে এর ফল, বীজ এবং বাকল ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসায়। বহেড়ার কাঠ হরিদ্রাভ ও শক্ত। এ কাঠ সহজে পানিতে পচে না। এটি নৌকা তৈরিতে ব্যবহার হয়। ফল থেকে লেখার কালি বানানো হয়। বীজ থেকে বিশেষভাবে অঙ্কুরোদ্গম করা হয়।

ঔষধি গুণ: কথিত আছে, প্রতিদিন বহেড়া ভেজানো পানি এক কাপ পরিমাণ পান করলে দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। বহেড়া হৃৎপিণ্ড এবং যকৃৎ রোগের আক্রমণ কমায়। সর্দি-কাশি নিরাময় করে। এটা কৃমিনাশক, স্বরনাশক এবং অনিদ্রা দূর করে। এ ছাড়া পাইলস, হাঁপানি ও কুষ্ঠরোগে বহেড়ার চিকিৎসা বেশ ফলপ্রসূ।

আমলকীঃ

আমলকী বা 'আমলকি' একপ্রকার ভেষজ ফল। সংস্কৃত ভাষায় এর নাম 'আমালিকা'।

কাঁচা আমলকি: আমলকি নিয়ে প্রাথমিক গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। এতে দেখা গেছে যে, এটি ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে পারে। প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং অস্টিওপোরোসিস রোগে আমলকির রস কিছু কাজ করে। কয়েক ধরনের ক্যান্সারের বিরুদ্ধেও এর কার্যকারিতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগেও আমলকি কার্যকর বলে ইঁদুরের উপর চালিত গবেষণায় প্রমান মিলেছে। প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগের পরে ক্ষতিগ্রস্ত প্যানক্রিয়াস (অগ্ন্যাশয়) -এর ক্ষত সারাতে আমলকি কার্যকর। আমলকির ফল, পাতা ও ছাল থেকে তৈরি পরীক্ষামূলক ওষুধে কিছু রোগ নিরাময়ের প্রমাণ পাওয়া গেছে যেমন- ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, প্রদাহ এবং কিডনি-রোগ। আমলকি মানুষের রক্তের কোলেস্টেরল-মাত্রা হ্রাস করতে পারে বলে প্রমাণ রয়েছে ডায়াবেটিক ইঁদুরের উপর চালানো এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমলকির রস রক্তের চিনির মাত্রা কমাতে পারে এবং লিভারের কর্মক্ষমতা পুনরোদ্ধারে সাহায্য করতে পারে।

আমলকিতে প্রচুর ভিটামিন-সি বা এস্করবিক এসিড থাকে (৪৪৫ মিগ্রা/১০০ গ্রাম)। তা সত্ত্বেও আরো অন্যান্য উপাদান নিয়ে মতভেদ আছে এবং আমলকির 'এন্টি-অক্সিডেন্ট'রূপে কার্যকারিতার পেছনে মূল ভূমিকা ভিটামিন-সি এর নয়, বরং 'এলাজিটানিন' নামক পদার্থসমূহের বলে মনে করা হয়।যেমন এমব্লিকানিন-এ (৩৭%), এমব্লিকানিন-বি (৩৩%), পানিগ্লুকোনিন (১২%) এবং পেডাংকুলাগিন (১৪%).এতে আরো আছে পানিক্যাফোলিন, ফিলানেমব্লিনিন-এ, বি, সি, ডি, ই এবং এফ।এই ফলে অন্যান্য 'পলিফেনল'ও থাকে। যেমন- ফ্ল্যাভোনয়েড, কেমফেরল, এলাজিক এসিড ও গ্যালিক এসিড।

ব্যবহারঃ

আমলকির ভেষজ গুণ রয়েছে অনেক। ফল ও পাতা দুটিই ওষুধরূপে ব্যবহার করা হয়। আমলকিতে প্রচুর ভিটামিন 'সি' থাকে। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে, আমলকিতে পেয়ারা ও কাগজি লেবুর চেয়ে ৩ গুণ ও ১০ গুণ বেশি ভিটামিন 'সি' রয়েছে। আমলকিতে কমলার চেয়ে ১৫ থেকে ২০ গুণ বেশি, আপেলের চেয়ে ১২০ গুণ বেশি, আমের চেয়ে ২৪ গুণ এবং কলার চেয়ে ৬০ গুণ বেশি ভিটামিন 'সি' রয়েছে।

একজন বয়স্ক লোকের প্রতিদিন ৩০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' দরকার। দিনে দুটো আমলকি খেলে এ পরিমাণ ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়। আমলকি খেলে মুখে রুচি বাড়ে।স্কার্ভি বা দন্তরোগ সারাতে টাটকা আমলকি ফলের জুড়ি নেই। এছাড়া পেটের পীড়া, সর্দি, কাশি ও রক্তহীনতার জন্যও খুবই উপকারী।লিভার ও জন্ডিস রোগে উপকারী বলে আমলকি ফলটি বিবেচিত। আমলকি, হরিতকী ও বহেড়াকে একত্রে ত্রিফলা বলা হয়। এ তিনটি শুকনো ফল একত্রে রাতে ভিজিয়ে রেখে সকালবেলা ছেঁকে খালি পেটে শরবত হিসেবে খেলে পেটের অসুখ ভালো হয়।বিভিন্ন ধরনের তেল তৈরিতে আমলকি ব্যবহার হয়। কাঁচা বা শুকনো আমলকি বেটে একটু মাখন মিশিয়ে মাথায় লাগালে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম আসে।কাঁচা আমলকি বেটে রস প্রতিদিন চুলে লাগিয়ে দুতিন ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এভাবে একমাস মাখলে চুলের গোড়া শক্ত, চুল উঠা এবং তাড়াতড়ি চুল পাকা বন্ধ হবে।

ঔষধি গুণ ও উপকারিতাঃ

ভিটামিন সি'সমৃদ্ধ আমলকীতে প্রচুর পরিমাণে এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান রয়েছে। বিভিন্ন অসুখ সারানো ছাড়াও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে তুলতেও আমলকী দারুণ সাহায্য করে। আমলকীর গুণাগুণের জন্য আয়ুর্বেদিক ওষুধেও এখন আমলকীর নির্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে।

১। আমলকী কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের উপর কাজ করে।

২। বমি বন্ধে কাজ করে।

৩। দীর্ঘমেয়াদি কাশি সর্দি হতে উপকার পাওয়ার জন্য আমলকীর নির্যাস উপকারী।

৪। এটি হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের শক্তিবর্ধক।

৫। আমলকী ত্বক, চুল ও চোখ ভাল রাখার জন্য উপকারী। এতে রয়েছে ফাইটো-কেমিক্যাল যা চোখের সঙ্গে জড়িও ডিজেনারেশন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

৬। আমলকী হজমে সাহায্য করে ও স্টমাক এ্যাসিডে ব্যালেন্স বজার রাখে।

৭। আমলকী লিভার ভাল রাখে, ব্রেনের কার্যকলাপে সাহায্য করে ফলে মেন্টাল ফাংশনিং ভাল হয়।

৮। আমলকী ব্লাড সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রেখে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। কোলেস্টেরল লেভেলেও কম রাখাতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

৯। হার্ট সুস্থ রাখে, ফুসফুসকে শক্তিশালী করে তোলে।

১০।শরীর ঠান্ডা রাখে, শরীরের কার্যৰমতা বাড়িয়ে তোলে, মাসল টোন মজবুত করে।

১১। লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা বাড়িয়ে তুলে দাঁত ও নখ ভাল রাখে।

১২।জ্বর, বদহজম, সানবার্ন, সানস্ট্রোক থেকে রৰা করে।

১৩।আমলকীর জুস দৃষ্টি শক্তি ভাল রাখার জন্য উপকারী। ছানি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। ব্রণ ও ত্বকের অন্যান্য সমস্যায় উপকারী।

১৪।পেটের জ্বালা জ্বালাভাব কম রাখে। লিভারের কার্যকলাপে সাহায্য করে, পাইলস সমস্যা কমায়।

১৫।শরীরের অপ্রয়োজনীয় ফ্যাট ঝরাতে সাহায্য করে। ব্রঙ্কাইটেসও এ্যাজমার জন্য আমলকীর জুস উপকারী।

১৬।আমলকী গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য মধু ও মাখন মিশিয়ে খাওয়ার আগে থেকে পারেন। খিতে বাড়াতে সাহায্য করে।

১৭।এক গ্লাস দুধ বা জলের মধ্যে আমলকী গুঁড়ো ও সামান্য চিনি মিশিয়ে দিনে দু'বার খেতে পারেন। এ্যাসিডেটের সমস্যা কম রাখতে সাহায্য করবে।

১৮।আমলকীতে সামান্য লবণ, লেবুর রস মাখিয়ে রোদে রাখুন। শুকিয়ে যাওয়ার পর খেতে পারেন।

১৯।খাবারের সঙ্গে আমলকীর আচার খেতে পারেন। হজমে সাহায্য করবে।

২০।আমলকী মাঝারি আকারে টুকরো করে নিয়ে ফুটন্ত পানির মধ্যে দিন। আমলকী নরম হয়ে তরে নামিয়ে ঝরিয়ে লবণ, আদা কুঁচি, লেবুর রস মাখিয়ে রোদে রেখে দিতে পারেন। সারা বছরই ভাল থাকবে।

নিমঃ

নিম একটি ঔষধি গাছ, বৈজ্ঞানিক নাম (AZADIRACHTA INDICA)। এর ডাল, পাতা, রস, সবই কাজে লাগে। নিম একটি বহু বর্ষজীবি ও চির হরিত বৃক্ষ। কৃমিনাশক হিসেবে নিমের রস খুবই কার্যকর।নিমের কাঠ খুবই শক্ত। এ কাঠে কখনো ঘুণ ধরে না। পোকা বাসা বাঁধে না। উইপোকা খেতে পারে না। এ কারণে নিম কাঠের আসবাবপত্রও তৈরি করা হচ্ছে আজকাল। এছাড়া প্রাচীনকাল থেকেই বাদ্যযন্ত্র বানানোর জন্য কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে। এর উৎপাদন ও প্রসারকে উৎসাহ এবং অন্যায়ভাবে নিম গাছ ধ্বংস করাকে নিরুৎসাহিত করছে। নিমের এই গুনাগুনের কথা বিবেচনা করেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'একুশ শতকের বৃক্ষ' বলে ঘোষনা করেছে।

নিম একটি বহু বর্ষজীবি ও চির হরিত বৃক্ষ।নিম গাছের পাতা, ফল, ছাল বা বাকল, নিমের তেল,বীজ। এক কথায় নিমের সমস্ত অংশ ব্যবহার করা যায়।

ঔষধি গুণাগনঃ

বিশ্বব্যাপী নিম গাছ, গাছের পাতা, শিকড়, নিম ফল ও বাকল ওষুধের কাঁচামাল হিসেবে পরিচিত। বর্তমান বিশ্বে নিমের কদর তা কিন্তু এর অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যহারের জন্য। নিম ছত্রাকনাশক হিসেবে, ব্যাকটেরিয়া রোধক হিসেবে ভাইরাসরোধক হিসেবে, কীট-পতঙ্গ বিনাশে চ্যাগাস রোধ নিয়ন্ত্রণে, ম্যালেরিয়া নিরাময়ে,দন্ত চিকিতসায় ব্যাথামুক্তি ও জ্বর কমাতে, জন্ম নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহারঃ

১। কফজনিত বুকের ব্যথা: অনেক সময় বুকে কফ জমে বুক ব্যথা করে। এ জন্য ৩০ ফোটা নিম পাতার রশ সামান্য গরম পানিতে মিশিয়ে দিতে ৩/৪ বার খেলে বুকের ব্যথা কমবে। গর্ভবতী,শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য এ ঔষধটি নিষেধ।

২। কৃমি: পেটে কৃমি হলে শিশুরা রোগা হয়ে যায়। পেটে বড় হয়। চেহারা ফ্যকাশে হয়ে যায়। এ জন্য ৫০ মিলিগ্রাম পরিমাণ নিম গাছের মূলের ছালের গুড়া দিন ৩ বার সামান্য পানি গরমসহ খেতে হবে।

৩। উকুন নাশ: নিমের পাতা বেটে হালকা করে মাথায় লাগান। ঘন্টা খানেক ধরে মাথা ধুয়ে ফেলুন। ২/৩ দিন এভাবে লাগালে উকুন মরে যাবে।

৪। অজীর্ণ: অনেকদিন ধরে পেটে অসুখ। পাতলা পায়খানা হলে ৩০ ফোটা নিম পাতার রস, সিকি কাপ পানির সঙ্গে মিশিয়ে সকাল- বিকাল খাওয়ালে উপকার পাওয়া যাবে।

৫। খোস পাচড়া: নিম পাতা সিদ্ধ করে পানি দিয়ে গোসল করলে খোসপাচড়া চলে যায়। পাতা বা ফুল বেটে গায়ে কয়েকদিন লাগালে চুলকানি ভালো হয়।

৬। পোকা-মাকড়ের কামড়: পোকা মাকড় কামল দিলে বা হুল ফোটালে নিমের মূলের ছাল বা পাতা বেটে ক্ষত স্থানে লাগালে ব্যথা উপশম হবে।

৭। দাতের রোগ: নিমের পাতা ও ছালের গুড়া কিংবা নিমের চাল দিয়ে নিয়মিত দাত মাজলে দাত হবে মজবুত, রক্ষা পাবে রোগ।

৮। জন্ম নিয়ন্ত্রণে নিম: নিম তেলা একটি শক্তিশালী শুক্রানুনাশক হিসেবে কাজ করে। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, নিম তেল মহিলাদের জন্য নতুন ধরনের কার্যকরী গর্ভনিরোধক হতে পারে। এটি ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই শুক্রানু মেরে ফেলতে সক্ষম।

মুখের দাগ দূর করার সব থেকে ভাল ওষুধ হল নিম। মুখে ব্রনের সমস্যায় ভুগছেন? চিন্তা করার দরকার নেই। নিম পাতার প্যাক মেখেই আপনি এর থেকে পরিত্রান পেতে পারেন। কি করে তৈরি করবেন এই প্যাকটা চলুন জেনে নিই। চার পাঁচটা নিম পাতা ভাল করে ধুয়ে মিক্সিতে পিষে নিন। এর মধ্যে এক চামচ মূলতানি মাটি, অল্প গোলাপ জল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। প্যাকটা যদি গাঢ় হয়ে যায় তাহলে ওর মধ্যে গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। মুখে লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষন রেখে দিন। প্যাকটা মুখে শুকিয়ে গেলে হালকা উষ্ণ জল দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলুন।

পুদিনাঃ

পুদিনা পাতা প্রাচীনকাল থেকেই বেশ জনপ্রিয় ঔষধ হিসেবে পরিচিত। বহু রোগ আরোগ্যে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পুদিনা পাতা এক ধরনের সুগন্ধি গাছ। এই গাছের পাতা তরি-তরকারির সাথে সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে বেশি ব্যবহার করা হয় নানা ধরনের বড়া তৈরির কাজে।

পুদিনা এক প্রকারের গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। বিশ্বের অনেক দেশেই পুদিনার গাছ জন্মে। এর পাতা সুগন্ধি হিসাবে রান্নায় ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার ও ওষধি গুণঃ

• পেটের পীড়ায় : এটি ইরেটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম এবং দীর্ঘস্থায়ী বদহজমের বিরুদ্ধে খুবই কার্যকর। এছাড়াও পুদিনা কোলনের পেশী সংকোচন নিয়ন্ত্রন করে।

• অ্যাজমা : পুদিনায় রোজমেরিক এসিড নামের এক ধরনের উপাদান থাকে। এটি প্রাকপ্রদাহী পদার্থ তৈরীতে বাধা দেয়। ফলে অ্যাজমা হয় না। এছাড়াও এ ঔষধি প্রোস্টসাইক্লিন তৈরীতে বাধা দেয়। তাতে শাসনালী পরিষ্কার থাকে।

• এন্টিক্যান্সার : পুদিনায় রয়েছে মনোটারপিন নামক উপাদান। এটি স্তন, লিভার এবং প্যানক্রিয়াসে ক্যান্সার হওয়া প্রতিরোধ করে। নিয়মিত পুদিনা পাতা খেলে ফুসফুস, কোলন এবং ত্বকের ক্যান্সার থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

• পুদিনার তাজা পাতা পিষে মুখে লাগিয়ে কিছুক্ষণ পর যদি তা ধুয়ে ফেলা যায়, তা হলে মুখের তৈলাক্ত ভাব দূর হয়ে যায়। ব্রণ ওঠাও বন্ধ হয়।

• পুদিনার পাতা পিষে রস করে তার ভেতর দু'তিন ফোঁটা লেবুর রস দিয়ে তা পান করলে ক্লান্তিভাবও দূর হয়।

• কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে পড়লে তার নাকের কাছে কিছু তাজা পুদিনা পাতা ধরুন। দেখবেন, জ্ঞান ফিরে পেয়েছে লোকটি।

• পুদিনার পাতা ভালো করে পিষে তার রস ভালো করে মাথায় ব্যবহার করেন। যাদের চুলে উকুন আছে, তারা খুব উপকার পাবেন।

• শরীরের ব্যথা দূর করতে পুদিনা পাতার চা খুব কাজে দেয়।

• মাথা ও পেট ব্যথা নিরাময়েও পুদিনার পাতা খুব উপকারী।

• যাদের মাঝে মধ্যে হেঁচকি ওঠে, তারা পুদিনা পাতার সঙ্গে গোল মরিচ পিষে তা ছেঁকে নিয়ে রসটুকু পান করুন। দেখবেন হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেছে।

• কফ-কাশিতে আমরা সাধারণত এক্সপেক্টোরেন্ট জাতীয় ওষুধ খেয়ে থাকি। এক্সপেক্টোরেন্টের কাজ হলো গলা থেকে কফ বের করে দেয়া। কিন্তু এর একটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে। এসব ওষুধ খেলে ঘুম ঘুম ভাব হয়। তাই এর বিকল্প হিসেবে আপনি পুদিনা পাতার সাহায্য নিতে পারেন। গরম পানিতে সামান্য পরিমাণ পুদিনা পাতা সেদ্ধ করে পান করুন। পুদিনা পাতা এক্সপেক্টোরেন্টের কাজ করবে।

• পুদিনা পাতা আপনার উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করবে।

আফটার স্কুলে ঘরোয়া ভাবে চৌবাচ্চায় শিঙ্গি-মাগুর মাছ চাষের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ১ঘঃ ৩০মিঃ

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১০ মিনিট
২)	শিঙ্গি-মাগুর মাছের খাদ্যগুণ এভং ঘরোয়া ভাবে চৌবাচ্চায় এই মাছ চাষের প্রয়োজনীয়তা	১০ মিনিট
৩)	উপযুক্ত মরশুম এবং চৌবাচ্চার পরিমাপ	১৫ মিনিট
৪)	শিঙ্গি-মাগুর মাছের চাষাবাদ পদ্ধতি, যত্ন ও খাবার	১৫ মিনিট
৫)	ভিডিও দেখানো হবেঃ "GHOROYA VABE SING MAGUR CHAS-mpeg	৫ মিনিট
৬)	শিং – মাগুর মাছের রোগবালাই ও তার প্রতিকার	১৫ মিনিট
৭)	শিং – মাগুর মাছের রোগ ও তার প্রতিকার নিয়ে একটি ভিডিও দেখানো হবে "SING-MAGUR ROG O PROTIKAR- mp4"	৫ মিনিট
৮)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব	১০ মিনিট
৯)	প্রশিক্ষার্থীদের হ্যান্ডবিল SING MAGUR CHAS handbill.pdf বিতরণ	৫ মিনিট

ঘরোয়া ভাবে জিওল মাছের চাষ

শিং মাগুর মাছ আমাদের দেশের কে না চেনে? মাছ প্রিয় মানুষমাত্রই জিওল মাছের ভক্ত। অন্যান্য মাছের তুলনায় এই জিওল মাছের চাহিদা অনেক বেশি। এবং এই সকল জিওল মাছের দামও অনেক বেশি। সুস্বাদু ও উপাদেয় এ মাছ দেশের সব শ্রেণীর মানুষের কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। বাড়িতে যে কোন পাত্রে অনেক দিন পর্যন্ত জীবিত রাখা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে দেশে জিওল মাছের আকাল চলছে। আপনি ইচ্ছা করলে বাড়িতে চৌবাচ্চায় শিং, মাগুর মাছের চাষ করতে পারেন।

শিং - মাগুর খাদ্য গুণাগুণঃ

ক) শিং মাগুর মাছের মধ্যে অনেক ধরনের খাদ্য গুনাগুন রয়েছে। এই মাছটি খেতে অনেক সুস্বাদু।

খ) পুষ্টির দিক দিয়ে এই মাছ অন্য সব মাছের তুলনায় সবার উপরে। রোগীর পথ্য হিসেবে শিং-মাগুরের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

গ) রক্ত স্বল্পতায় ভোগা অনেক রুগী এই মাছ পথ্য হিসেবে খেয়ে থাকেন।

শিং - মাগুর মাছ চাষে কি ধরণের চৌবাচ্চা বাছাই করবেনঃ

বাড়িতে শিং মাগুর মাছ চাষ করার জন্য আপনি মাঝারি অথবা বড় সাইজের সিমেন্ট বা প্লাস্টিক (৮ ফুট x ৪ ফুট x ৩ ফুট মাপের) চৌবাচ্চার ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন চৌবাচ্চাটি যেন গভীর হয় (৩ থেকে ৪ ফুট)।

চৌবাচ্চার তলায় ৫ সেমি পুরু মাটির স্তর তৈরি করতে হবে। জল ভরে ৮-১০ গ্রাম ওজনের প্রতি বর্গফুটে ৮-১০টি মাছ মজুত করতে হবে। জল ঢোকানো ও বের করে দেওয়ার জন্য নল থাকতে হবে। ঠিকমত পালন করলে ৩-৪ মাস পরে চৌবাচ্চা থেকে ৩০-৪০ গ্রাম ওজনের ১২-১৬ কেজি মাগুর মিলবে।

শিং - মাগুর মাছ চাষ করার সঠিক সময় বা মরশুমঃ

ক) বাড়িতে শিং মাগুর মাছ চাষ করার জন্য আপনি বছরের যেকোন সময় নির্বাচন করতে পারেন। তবে এই মাছ চাষের আদর্শ সময় এপ্রিল-মে মাস।

খ) এছাড়াও জুন-জুলাই মাসেও এই মাছের চাষ করা যায়।

গ) তবে খেয়াল রাখবেন যে বাড়িতে চৌবাচ্চায় শিং মাগুর মাছের পোনা ছাড়ার ক্ষেত্রে আপনাকে সকাল অথবা সন্ধ্যা এই দুই সময়ের যেকোন একটি নির্বাচন করতে হবে কারণ এসময় তাপমাত্রা সহনীয় অবস্থায় থাকে তা না হলে মাছ মরে যেতে পারে।

কিভাবে শিং - মাগুর মাছের পোনা ছাড়তে হবে ও সঠিক নিয়মে যত্ন নিতে হবেঃ

ক) বাড়িতে চৌবাচ্চায় শিং মাগুর মাছ চাষ করার জন্য আপনাকে প্রথমে পোনা সংগ্রহ করতে হবে।

খ) এই ক্ষেত্রে আপনি আপনার নিকটস্থ যেকোন নার্সারী হতে পোনা নিতে পারেন।

গ) এছাড়াও আপনি প্রাকৃতিক ভাবে খাল, বিল কিংবা যেকোন ধরণের জলাশয় থেকে পোনা সংগ্রহ করতে পারেন। এখন বর্তমানে শিং মাগুর মাছের পোনা পলিব্যাগে কিনতে পাওয়া যায় সেখান থেকেও পোনা নিতে পারেন। তবে পোনা ছাড়ার পর আপনাকে পোনার সঠিক নিয়মে যত্ন নিতে হবে।

সঠিক নিয়মে শিং - মাগুর মাছের চাষাবাদ পদ্ধতি বা কৌশল

ক) চৌবাচ্চায় শিং মাগুর মাছ চাষ করার জন্য আপনাকে সঠিক নিয়ম অবলম্বন করতে হবে।

খ) চৌবাচ্চায় পোনা ছাড়ার ক্ষেত্রে প্রথমে অক্সিজেন সহ যে ব্যাগে পোনা আনা হবে পোনা সহ সেই ব্যাগ যে জলে পোনা ছাড়া হবে সেখানে ভাসিয়ে রাখতে হবে।

গ) এরপর সেই পলিব্যাগের জল ও চৌবাচ্চার জলের তাপমাত্রা একই মাত্রায় আনতে হবে।

ঘ) তারপর ব্যাগের মুখ খুলে যে চৌবাচ্চায় পোনা ছাড়া হবে সেই চৌবাচ্চার জল অল্প অল্প করে ব্যাগে দিতে হবে এবং ব্যাগের জল অল্প অল্প করে চৌবাচ্চায় ফেলতে হবে।

ঙ) ৪০-৫০ মিনিট সময় ধরে এরূপভাবে পোনাকে চৌবাচ্চার জলের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। এরপর শিং, মাগুর মাছের পোনা জলে ছাড়তে হবে।

শিং - মাগুর মাছের খাবারের পরিমাণ ও সঠিক নিয়মে খাবার প্রয়োগঃ

ক) শিং মাগুর মাছ চাষে সাধারণত বেশী খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

খ) আমিষ জাতীয় খাবার এই মাছের বেশি পছন্দ। এরা রাতের দিকে খেতে পছন্দ করে তাই দৈনিক মোট খাবারের ৩/৪ ভাগ সন্ধ্যায় এবং বাকি ১/৪ ভাগ সকালে দিতে হবে।,

গ) ভাল ফলন পেতে হলে শিং মাগুর মাছের চৌবাচ্চায় শুঁটকি মাছের গুঁড়ো, গেঁড়ি-গুগলি, শামুক-ঝিনুক, সয়াবিন চূর্ণ, ভুট্টা চূর্ণ, গমের ভূসি, ধানের কুঁড়া, সরিষার খৈল, চিটাগুড় ইত্যাদি খাবার নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

ঘ) বিশেষ করে শুকনো মাছের গুঁড়ো ও চালের কুঁড়ো প্রথম মাসে ১:৩, দ্বিতীয় মাসে ১:১ এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম মাসে ৩:১ অনুপাতে দিলে মাছের ভাল ফলন পাওয়া যায়।

শিং - মাগুর মাছের রোগ বালাই ও তাঁর প্রতিকারঃ

ক) শিং মাগুর মাছের মূলত তেমন কোন রোগ বালাই হয় না।

খ) তবে মাঝে মধ্যে মাছের গায়ে সাদা ফুসকুড়ি দেখা যায়। এটা দেখা গেলে সাথে সাথে চৌবাচ্চার জলে উপযুক্ত ওষুধ দিতে হবে।

রোগ	রোগের লক্ষণ	প্রতিকার
ব্যাকটেরিয়া ঘটিত	গায়ে ঘা, ঠোঁট লালচে, শুঁড় খসে পড়া	প্রতি কেজি পরিপূরক খাবারের সঙ্গে ১০০ মিলিগ্রাম সালফাডাইয়া জিন বা টেরামাইসিন বা রেক্টিক্লিন মিশিয়ে ৭ দিন দিনে হবে
	পেটে জল জমা	প্রতি কেজি পরিপূরক খাবারের সঙ্গে ১০০ মিলিগ্রাম অ্যান্টিবায়োটিক মিশিয়ে ৭ দিন দিনে হবে
কৃমি রোগ	পেট ফুলে যায়	আক্রান্ত মাছকে চৌবাচ্চা থেকে তুলে ফেলতে হবে

প্রোটোজোয়া ঘটিত	পোস্ত দানার মত লালচে সাদা গুটি	লিটার প্রতি জলে ১ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশিয়ে আক্রান্ত মাছকে ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে

সতর্কতাঃ হাইব্রিড মাগুর চাষ নিষিদ্ধ এবং পুকুরে চাষ করলে আঁতুর পুকুরে ডিম পোনার সাথে জিওল মাছ চাষ করা উচিত নয়।

ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ

প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগ

শিং - মাগুর মাছ চাষে সার প্রয়োগঃ

ক) শিং মাগুর মাছ চাষ করার জন্য আপনাকে চৌবাচ্চায় সঠিক নিয়মে সার প্রয়োগ করতে হবে।

খ) মাঝেমধ্যে ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার প্রয়োগ করতে হবে।

গ) এতে জলের গুণাগুণ বজায় থাকে এবং মাছের কোন ক্ষতি হয় না বরং এতে মাছের বৃদ্ধি অনেক ভাল হয়।

কিভাবে শিং - মাগুর মাছের যত্ন নিবেনঃ

ক) বাড়িতে চৌবাচ্চা বা অন্য যেকোন ধরণের পাত্রে শিং মাগুর মাছের চাষ করার ক্ষেত্রে সঠিক যত্ন নিতে হবে।

খ) সঠিকভাবে মাছের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাস দরকার,। প্রচন্ড রোদে যেন চৌবাচ্চার জল বেশি গরম না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

গ) এছাড়াও যদি জলের কোন সমস্যা হয় তাহলে জল পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) এছাড়াও চৌবাচ্চার তলদেশ সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নন রাখতে হবে। মাছের যত্ন নিতে হবে।

কখন শিং - মাগুর মাছ সংগ্রহ করবেনঃ

ক) বাড়িতে চৌবাচ্চায় সঠিক নিয়মে শিং মাগুর মাছের চাষ করার পর তা বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

খ) মাগুর মাছ ৮-১০ মাস আর শিং মাছ ৪-৬ মাসের মধ্যেই খাওয়ার উপযোগী হয়ে যায়।

কি পরিমাণে শিং - মাগুর মাছ পাবেনঃ

বাড়িতে চৌবাচ্চায় সঠিক নিয়মে শিং মাগুর মাছ চাষ করলে সেখান থেকে আপনি প্রচুর পরিমাণে শিং মাগুর মাছ পেতে পারেন যা আপনার পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে আপনি ইচ্ছা করলে এই মাছ বাজারে বিক্রিও করতে পারেন।

আফটার স্কুলে ঘরোয়া ভাবে শিঙ্গি-মাগুর মাছের ডিম ফোটানোর প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন, পুরুষ ও স্ত্রী মাছ (১৫০ গ্রাম মত ওজন হরে), কাঁচি, স্যালাইন ওয়াটার, তুলো, ধারালো কাঁচি, ২ টি পাত্র, ১টি ছোট কাঁচের পাত্র, ড্রপার, লবঙ্গ তেল, অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল, ইঞ্জেকশন দেবার জন্য সিরিঞ্জ ও সূঁচ, ডিসটিল ওয়াটার, ডিম ফোটানোর হর্মোণ, খুব মিহি নাইলন নেটের একটি ছোট টুকরো, সার্জিকাল ব্লেড

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৩ঘঃ ৩০মিঃ

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১০ মিনিট
২)	প্রজননকারী মাছ সংগ্রহ ও তার যত্ন	১০ মিনিট
৩)	স্ট্রিপিং পদ্ধতি	১৫ মিনিট
৪)	স্ত্রী মাছ থেকে ডিম সংগ্রহ পদ্ধতি	১৫ মিনিট
৫)	পুরুষ মাছ থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ পদ্ধতি	১৫ মিনিট
৬)	শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ পদ্ধতি	১৫ মিনিট
৭)	স্ত্রী ও পুরুষ মাছ থেকে ডিম ও শুক্রানু সংগ্রহ ও নিষীক্তকরণ পদ্ধতির ভিডিওদেখানোহবেঃSINGMAGURMACHERDIMNISIKTOKARONER KOUSHAL- mp4	৫ মিনিট
৮)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
৯)	প্রশিক্ষার্থীদের হ্যান্ডবিল বিতরণ	৫ মিনিট
১০)	হাতে কলমে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ ও নিষিক্তকরণ	৬০ মিনিট
১১)	পরবর্তী বিশেষ বিশেষ ধাপের আলোচনা	৩০ মিনিট
১২)	সমগ্র আলোচনার বিশেষ বিশেষ অংশ পুনরায় রোমন্থন ও হ্যান্ডবিলের বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাখ্যা	১৫ মিনিট

দেশি মাগুর মাছের কৃত্রিম প্রজনন

খেতে সুস্বাদু। স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ওষধি গুণমানের জন্য বিশ্বখ্যাত। সব দিক দিয়ে দেশি মাগুরের ভাল চাহিদা বাজারে। কিন্তু এর চারাপোনা সহজলভ্য নয় বলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই মাছের চাষ করতে পারেন না অনেকে। প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে বাড়িতেই পোনা তৈরি করে অবশ্য মাগুর চাষ করা যায়। সেই উপায় শিখে মাগুর মাছের চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের পঞ্চগ্রামের রফিকুল মিঞা।

মাত্র দু'বছরেই প্রণোদিত প্রজনন করানোয় পারদর্শী হয়ে উঠেছেন রফিকুল। চলতি মরসুমে ইতিমধ্যেই এক লক্ষেরও বেশি দেশি মাগুরের পোনা বিক্রি করে ফেলেছেন। নিজের ও লিজের মিলিয়ে বিঘা দশেকের পুকুরে অন্য মাছের সঙ্গে মাগুর চাষ করছেন তিনি। এই জেলারই তপন ব্লকের খলসি গ্রামের হরেকৃষ্ণ বিশ্বাস, বালুরঘাট ব্লকের স্বপন ভৌমিকও মাগুরের হ্যাচারি বানিয়ে চারাপোনা বিক্রি করছেন। এই ভাবে স্বনির্ভরতায় নতুন দিশা দেখাচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেশি মাগুরের চাষ।

প্রজননকারী মাছ সংগ্রহ ও যত্নঃ

কৃত্রিম প্রজননের জন্য বড় মাগুর মাছ নির্বাচন করা দরকার। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে এক বছর বয়সের ১০০ – ১৫০ গ্রামবিশিষ্ট মাছ বাজার থেকে কিংবা কোনও প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে সংগ্রহ করে আগে থেকে নির্মিত কোনও পুকুরে কিংবা সিমেন্টের তৈরি জলাধারে রাখতে হবে। পুকুরের বা সিমেন্টের জলাধারে জলের পরিবেশ ভালো রাখতে হবে এবং উচ্চ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য প্রত্যহ দিতে হবে। প্রজননকারী মাছের স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে তার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। মাছের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে ডিমের পরিমাণ বেশি হয়। মাছকে প্রত্যহ গুঁড়ো শুকনো মাছ ও চালের কুঁড়ো ৯ : ১ অনুপাতে মিশিয়ে মাছের দেহের ওজনের ১০ শতাংশ হারে প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে বা সিমেন্টের চৌবাচ্চায় প্রজননকারী মাছ ছাড়ার ঘনত্ব (স্টকিং ডেনসিটি) প্রতি ৪ বর্গমিটারে এক জোড়া (একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ)।

স্ট্রিপিং পদ্ধতি এবং মাছ সংগ্রহ ও যত্নঃ

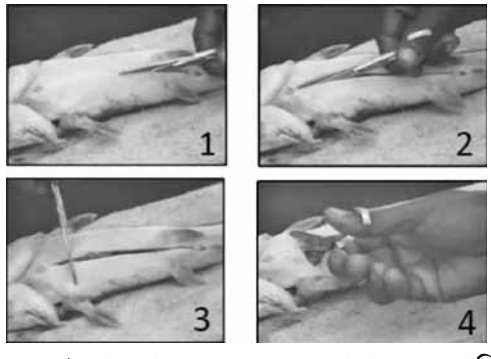

বর্তমানে প্রণোদিত প্রজননের মাধ্যমে মাগুর মাছের চারা উৎপাদন করা হচ্ছে। মাগুর মাছের প্রণোদিত প্রজনন ও পোনা মাছের প্রণোদিত প্রজননের মধ্যে মূল পার্থক্য হল পোনা মাছকে হরমোন ইনজেকশন দ্বারা উদ্দীপিত করে স্রোতযুক্ত জলাধারে ছাড়া হয়। কিন্তু মাগুর মাছের ক্ষেত্রে পুরুষ মাছের শুক্রাণু ও স্ত্রী মাছের ডিম্বাণু সংগ্রহ করে কৃত্রিম উপায়ে নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এই পদ্ধতিকে স্ট্রিপিং বা চাপ পদ্ধতি বলা হয়।

স্ট্রিপিং পদ্ধতিতে প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

১) মাছ হাতের মধ্যে ধরে রাখার জন্য পরিষ্কার নরম কাপড়

২) যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করার জন্য অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহল

৩) পুরুষ মাগুর মাছের পেট কেটে শুক্রাশয় বের করার জন্য সার্জিকাল ব্লেড

৪) শুক্রাশয়কে পেট থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য চিমটে

৫) শুক্রাশয়কে টুকরো টুকরো করার জন্য কাঁচি

৬) শুক্রাশয়কে ভালো ভাবে পেষাই করে শুক্ররস বের করার জন্য খুব সূক্ষ্ম ফাঁসের একখানি জাল

৭) স্ট্রিপিং–এর সময় ডিম সংগ্রহের জন্য গোল এনামেলের গামলা

৮) শুক্রাশয় থেকে রক্ত মোছার জন্য পরিষ্কার তুলো

৯) শুক্রাণুগুলিকে সচল রাখার জন্য ০.৯ শতাংশ নরম্যাল স্যালাইন

১০) ০.৯ শতাংশ নরম্যাল স্যালাইন-সহ শুক্ররস ধরে রাখার জন্য ছোট কাচের পাত্র

১১) ডিমের উপর শুক্ররসকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ড্রপার

১২) শুক্ররস ও ডিমকে ভালো ভাবে মেশানোর জন্য নরম ব্রাশ

১৩) শুক্ররস ও ডিমের মিশ্রণ পরিষ্কার করার জন্য ডিসটিলড ওয়াটার

১৪) স্ত্রী মাছকে হরমোন নির্যাস দেওয়ার জন্য পিটুইটারি গ্রন্থি

১৫) মাছ ও পিটুইটারি গ্রন্থি ওজনের জন্য দাঁড়িপাল্লা ও তুলাযন্ত্র

১৬) ইনজেকশন দেওয়ার জন্য সিরিঞ্জ ও সূঁচ

১৭) মাছকে চেতনাহীন করার জন্য ১:৪ অনুপাতে লবঙ্গ তেল ও অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলের দ্রবণ

১৮) নিষিক্ত ডিমগুলোকে জলের নীচে ছড়িয়ে রাখার জন্য মশারির জাল-সহ একটি লোহার ফ্রেম

১৯) হ্যাচিং–এর জন্য জল পরিবর্তনের ব্যবস্থা সহ বৃত্তাকার হ্যাচারি পুল

২০) প্রয়োজনে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য কিছু ছোট ছোট বায়ু সঞ্চালক যন্ত্র (এরেটর)

২১) ধানীপোনা পালনের জন্য কয়েকটি জল সরবরাহযুক্ত সিমেন্ট বা প্লাস্টিক বা ফাইবার ট্যাঙ্ক

প্রজননের জন্য মাছ প্রস্তুত করা

স্ত্রী মাছ প্রস্তুত করাঃ

বাহ্যিক লক্ষণ দেখে স্ত্রী মাছকে সনাক্ত করে আলাদা করতে হয়। এর পর পোনামাছের প্রণোদিত প্রজননের জন্য যে ভাবে পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস প্রস্তুত করা হয় সেই ভাবেই তৈরি করে স্ত্রী মাছের দেহে এই নির্যাস প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনের জন্য ৩০ – ৪০ মিলিগ্রাম পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস বা ২ মিলি/কেজি – ৫ মিলি/কেজি হরমোন প্রয়োগ করতে হয়। বর্তমানে বাজারে বাণিজ্যিক ভাবে বিভিন্ন ধরনের সিন্থেটিক হরমোন (ওভাপ্রিম, ওভাটাইড, ওভা এফ এইচ) ইত্যাদি পাওয়া যায়। এদের ব্যবহার করা যেতে পারে। মাগুর মাছের দেহে নিম্নলিখিত তিনটি অংশের যে কোনও একটি অংশে এই

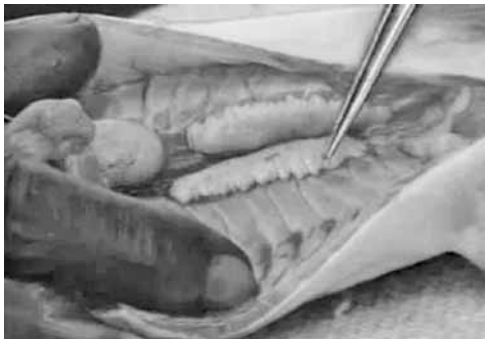

স্ত্রী মাছের হরমোন ইঞ্জেকশন পদ্ধতি

ইনজেকশন দেওয়া হয়ে থাকে —

১) ইনট্রা–মাসকুলার ইনজেকশন যা মাংসপেশির মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। এই পদ্ধতিতে শরীরের মাঝ বরাবর পৃষ্ঠ পাখনা ও পার্শ্বপাখনা ও পার্শ্বরেখার মাঝামাঝি জায়গায় ইনজেকশন দেওয়া হয়।

২) সাব–কিউটেনিয়াস ইনজেকশন যা চামড়া ও মাংসপেশির মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করানো হয়। এই পদ্ধতিতে শরীরের পায়ু পাখনাদ্বয়ের ঠিক নীচে জনন অঙ্গের দু' ধারে ইনজেকশন দেওয়া হয়।

৩) ইন্ট্রা- পেরিটোনিয়াল ইনজেকশন যা মাথার কাছাকাছি জায়গায় প্রবেশ করানো হয়। এই পদ্ধতিতে মাছের বক্ষ পাখনা দ্বয়ের ঠিক নীচে মাংসল অংশে ইনজেকশন দেওয়া হয়।

স্ত্রী মাছকে হরমোন প্রয়োগের কারণ হল এদের মধ্যে উত্তেজনা আনা এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে আটকে থাকা ডিমগুলোকে ক্রমশ বন্ধনমুক্ত করা যা পরবর্তীতে হাল্কা চাপ দিলে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসবে। স্ত্রী মাছকে ইনজেকশন দেওয়ার পর মাছকে জলভর্তি অ্যাকোরিয়াম বা চৌবাচ্চায় বা প্লাস্টিক গামলায় রাখা হয়। ১৫ থেকে ১৮ ঘণ্টা পরে এই মাছগুলোকে চাপ বা স্ট্রিপিং-এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

স্ত্রী মাছের স্ট্রিপিং ও ডিমের নিষিক্তকরণঃ

শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে আগে থেকে হরমোন ইনজেকশন দেওয়া স্ত্রী মাছটির মাথায় চেপে ধরে পেটে হাল্কা চাপ দিয়ে নির্গত ডিমগুলোকে একটি পরিষ্কার বড় এনামেল গামলাতে সংগ্রহ করা হয়। এই অবস্থাকে বলে ডিমের ফ্রি ফ্লোয়িং কন্ডিশন। স্ট্রিপিং–এর সময় পেটে যেন খুব জোরে চাপ না পড়ে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। চাপ জোরে হলে মাছের দেহের অভ্যন্তরের সম্পূর্ণ যন্ত্র নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং জননছিদ্র দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। স্ত্রী মাছের পেট থেকে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ডিম বেরিয়ে আসে ততক্ষণ হাল্কা চাপ দিয়ে যেতে হবে। হলুদাভ খয়েরি রঙের ডিমগুলো পেট থেকে বেরিয়ে গামলায় জমা হবে। পেটে চাপ দিতে দিতে যখন দেখা যাবে জননঅঙ্গে হাল্কা রক্তের দ্রবণ বেরোতে শুরু করবে তখন বোঝা যাবে সম্পূর্ণ ডিম বেরিয়ে গেছে, এই সময় চাপ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। সাধারণত একটি ১০০ গ্রাম মাগুর মাছ থেকে ৩ – ৪ হাজার ডিম বেরোতে পারে। ডিম নির্গমণ শেষ হলে স্ত্রী মাছটিকে জলের পাত্রে ছেড়ে দিলে পুনরায় সতেজ হয়ে যায়। মাছটিকে ২ – ৩ ঘণ্টা রেখে সম্পূর্ণ উজ্জীবিত হলে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে ৫ – ১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পুকুরে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

ডিমের নিষিক্তকরণঃ

ডিম সংগ্রহ শুরু হলেই শুক্রাণু মিশ্রিত স্যালাইন দ্রবণ ড্রপার দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে ডিমের উপর ফেলে নরম তুলি দিয়ে ভালো ভাবে মেশাতে হবে যাতে ডিমের নিষিক্তকরণ ভালো হয়। এর পর ডিম সমেত গামলাটিকে ভালো ভাবে নাড়াতে হবে। এর ফলে শুক্রাণুগুলো সমস্ত ডিমের উপর সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিষেকের হার বৃদ্ধি পায়। এর পরে আবার কিছুটা পরিষ্কার জল দিয়ে নিষিক্ত ডিমগুলিকে ভালো ভাবে ধুয়ে নিতে হয়। এর ফলে অতিরিক্ত মিল্ট বা শুক্ররস ধুয়ে যায় এবং ডিমের চটচটে ভাব প্রায় থাকে না।

শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ, স্ত্রী মাছের পেট থেকে ডিম বের করা এবং ডিমের নিষিক্তকরণ এই সমস্ত পদ্ধতিগুলি ২–৩ মিনিটের মধ্যে হওয়া দরকার। এর বেশি সময় অতিবাহিত হলে নিষেকের মাত্রা কমতে থাকে। তাই একসাথে দুটি দল কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

পুরুষ মাছ প্রস্তুত করাঃ

পুরুষ মাছে কোনও পিটুইটারি গ্রন্থির নির্যাস প্রয়োগ করতে হয় না। কারণ পরিণত মাছের শুক্রাশয় কেটে স্ত্রী মাছের ডিম্বাণুর সঙ্গে নিষিক্তকরণ করা হয়। এর ফলে পুরুষ মাছটি মারা যায়। যে স্ত্রী মাছের ডিমের সঙ্গে নিষিক্ততকরণ হবে সেই স্ত্রী মাছের সমান ওজনের পুরুষ মাছ নির্বাচিত করতে হবে। অনেক সময় পুরুষ মাছের শুক্রাশয় থেকে সংগৃহীত শুক্রাণুর পরিমাণ কম হয় তাই দু'টো পুরুষ মাছ নির্বাচিত করে কোনও চৌবাচ্চা বা প্লাস্টিক গামলায় পৃথক করে রাখতে হবে।

পুরুষ মাছের শুক্রাশয় ছেদন ও শুক্রাণু সংগ্রহঃ

পুরুষ মাছের শুক্রাণু বার করার পদ্ধতি

যে হেতু মাগুর মাছে কাঁটা থাকে এবং শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সংগ্রহের জন্য নাড়ানাড়ি করতে হয় তাই কাজের সুবিধার জন্য এদেরকে অচেতন করে নিতে হয়। পুরুষ ও স্ত্রী মাছকে লবঙ্গ তেল ও অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলের দ্রবণ মিশ্রিত জলে ছাড়া হয়। লবঙ্গ তেল ও অ্যাবসোলিউট অ্যালকোহলের মিশ্রণের অনুপাত ১ : ৪। ৫০ লিটার জলে ৫ মিলিলিটার দ্রবণ ভালো ভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। এই মিশ্রণটি চেতনানাশকের কাজ করে। পাত্রে অবশ্যই বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখা উচিত। ২০ – ২৫ মিনিটের মধ্যে মাছ চেতনা হারায়। অচেতন মাছকে প্রয়োজনমতো নাড়াচাড়া করা যায়। আবার কাজ হয়ে গেলে পরিষ্কার জলের স্রোতে রাখলে পুনরায় চেতনা ফিরে আসে। যাঁরা এই কাজে অভিজ্ঞ তাঁরা সরাসরি জ্যান্ত মাছকে নিয়ে কাজ করতে পারেন।

শুক্রাণু সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে পুরুষ মাছটির পেট উপর দিকে করে সার্জিক্যাল ব্লেড দিয়ে পেট চিরে ক্ষুদ্রান্তের নীচে থেকে শুক্রাশয় দু'টি বের করা হয়। তুলো দিয়ে শুক্রাশয় দু'টিকে পরিষ্কার করে নিতে হয় যাতে এর গায়ে রক্ত, মাংসপিণ্ড লেগে না থাকে। এর পর শুক্রাশয় দু'টিকে কাঁচির সাহায্যে ছোট ছোট করে কেটে নিতে হয় এবং সংগৃহীত টুকরোগুলোকে খুব সূক্ষ্ম ফাঁসযুক্ত জালে বা কাপড়ে সংগ্রহ করে কাচের বাটিতে ০.৯ শতাংশ নর্মাল স্যালাইন দ্রবণে রাখতে হবে। ছোট ছোট কাচের বাটিতে প্রায় ২ মিলিলিটার নর্মাল স্যালাইন দ্রবণ রাখা হয়। ঘন ফাঁসের জালের মধ্যে থাকা টুকরো শুক্রাশয়গুলিকে আঙুলের দ্বারা চাপ দিলে যে মিল্ট বা শুক্ররস বেরোবে তা নর্মাল স্যালাইন দ্রবণে সংগৃহীত হবে। দেখা গেছে নর্মাল স্যালাইনের মধ্যে শুক্রাণু ৩ মিনিট পর্যন্ত সক্রিয় অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং এই শুক্রাণু ৪ মিনিটের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলতে হবে, তা না হলে নিষেকের মাত্রা অত্যাধিক কম বা একেবারেই হবে না।

নিষিক্ত ডিম থেকে হ্যাচলিং দশাঃ

নিষিক্ত ডিমগুলিকে একটি মশারির জালের ফ্রেমের উপর নরম ব্রাশের সাহায্যে এমন ভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যেন একটি ডিম আর একটি ডিমের সঙ্গে লেগে না থাকে। এই মশারির জালটি লোহার ফ্রেমের সঙ্গে টান টান করে লাগানো হয়। নেট ফ্রেমটি কোনও সিমেন্টের চৌবাচ্চা বা প্লাস্টিক ট্যাঙ্ক বা ফাইবারের ট্যাঙ্কে এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে এই ডিম-সহ ফ্রেমটি জলের উপরিতল থেকে ২ ইঞ্চি নীচে থাকে। এই চৌবাচ্চা বা ট্যাঙ্কের জলের গভীরতা ৪ – ৫ ইঞ্চি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ট্যাঙ্কে সর্বক্ষণ জল পরিবর্তনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন এবং নিষিক্ত ডিমগুলোর উপর দিয়ে সর্বদা একটি হাল্কা জলের স্রোত থাকবে। এর জন্য ট্যাঙ্কের জল প্রবেশের দ্বার বা ইনলেট এবং জল নির্গমনের দ্বার বা আউটলেট থাকবে। আউটলেট বা জল নির্গমনের পথটি ট্যাঙ্কের নীচের দিকে এমন ভাবে করতে হবে যাতে ট্যাঙ্কের দূষিত জল অনায়াসে বেরিয়ে যায়। এ ছাড়া এই ব্যবস্থা থাকার ফলে

ডিমগুলি সর্বদা অক্সিজেনযুক্ত জল পাবে এবং অনিষিক্ত ডিমের খোসা পচে জল দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যাতে মাগুরের পোনা বা হ্যাচলিং ট্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্য ইনলেট ও আউটলেটের মুখ সূক্ষ্ম নেট দ্বারা আটকানো থাকবে।

নিষিক্ত ডিমগুলিকে দেখতে স্বচ্ছ হবে এবং অনিষিক্ত ডিমগুলি অস্বচ্ছ হবে। এই ভাবে ডিমগুলোর উপর দিয়ে জলপ্রবাহ থাকার ১৮ – ২২ ঘণ্টার মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। এদেরকে হ্যাচলিং বলে। হ্যাচলিং-এর পেটের কাছে একটি কুসুমথলি থাকে। প্রায় ৪ দিন পর্যন্ত হ্যাচলিং কুসুমথলি থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। এই সময় এরা বাইরের খাবার খায় না। জলে পিএইচ ৭.০ – ৭.৫ এবং তাপমাত্রা ২৮ – ৩১ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেডের মধ্যে থাকা উচিত। তাপমাত্রার পরিবর্তনের উপর হ্যাচিং-এর সময়কাল বাড়ে বা কমে। হ্যাচিং সম্পূর্ণ হওয়ার পর ট্যাঙ্ক থেকে অনিষিক্ত ডিম, ডিমের খোসা সাইফন করে বের করে দিতে হবে। সর্বক্ষণ জলের প্রবাহ ছাড়াও প্রতি ৩ – ৪ ঘণ্টা অন্তর ট্যাঙ্কের নীচের জল সাইফনের মাধ্যমে বের করে দেওয়া দরকার। যতক্ষণ না হ্যাচলিং দশা স্পন দশায় পৌঁছয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই ভাবে ট্যাঙ্কের নীচের জল বের করে দিতে হবে। হ্যাচলিং অবস্থায় এদের দৈর্ঘ্য ৪ – ৫ মিলিমিটার এবং ওজনে ২৮ – ৩.২ মিলিগ্রাম হয়।

ধানীপোনা ও তার পরিচর্যাঃ

মাগুরের চারার বয়স ১৫ দিন হলে এদের ধানীপোনা বা ফ্রাই বলা হয়। এই সময় এরা দৈর্ঘ্যে ১৫ – ২০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয় এবং ওজনে প্রায় ৩০ – ৫০ মিলিগ্রাম মতো হয়। এই বয়সের পোনাকে প্রতি বর্গমিটারে ১০০০ – ১২০০টির বেশি না রাখা ভাল। ধানীপোনার বৃদ্ধি খুব দ্রুত হারে হয় এবং এদেরকে তৈরি করা খাবার বা জীবন্ত টিউবিফ্যাক্স খাবার হিসাবে দিতে হয়। পরিপূরক খাবার হিসাবে ঝিনুক, ডিম ও সোয়াবিনের বড়ি ভালো ভাবে সেদ্ধ করে মিক্সার মেশিনে দিয়ে লেই বানানোর পর তার সঙ্গে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি মেশানো হয়। প্রতি দিন পোনার মোট ওজনের দ্বিগুণ ওজনের খাবার খাবার কমপক্ষে ২ - ৩ বার খাবার দেওয়া প্রয়োজন। অতিরিক্ত খাবার যাতে পড়ে না থাকে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। বাড়তি খাবার সাইফনের মাধ্যমে বের করে দিতে হবে, তা না হলে জল যেমন দূষিত হবে সেই সঙ্গে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ দেখা যাবে। অক্সিজেনের ঘাটতি মেটাতে এবং জল পরিবর্তনের জন্য ফোয়ারার সাহায্যে জল ফেলা দরকার এবং সেই সঙ্গে নিকাশি ব্যবস্থার দ্বারা তা বের করা প্রয়োজন। মাগুর মাছের একটি বৈশিষ্ট্য হল হ্যাচিং–এর ১০ – ১২ দিন পরে এদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র সৃষ্টি হয় এবং এরা উলম্ব ভাবে জলের উপর ভেসে উঠে গিয়ে বাতাসে অক্সিজেন নেয়। এই ভাবে জলের নীচ থেকে জলের উপরিতলে যাওয়ার জন্য এদের প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়। জলে পরিমাণমতো অক্সিজেন থাকলেও এদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অতি অবশ্যই মাঝে মাঝে জলের উপরিতলে উলম্ব ভাবে এসে বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে হবে। এদের এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে লালন ট্যাঙ্কের জলের উচ্চতা বেশি রাখা চলবে না। জলের উচ্চতা খুব বেশি হলে এই ছোট ছোট বাচ্চারা জলের উপরিভাগে আসার দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রচুর শক্তি নষ্ট করবে বা যদি এরা বায়ু থেকে অক্সিজেন (যেটা এদের বাধ্যতামূলক করতে হবে) এই ভাবে নিতে না পারে তবে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সব চিন্তাভাবনা করে লালন ট্যাঙ্কে প্রথমে জলের গভীরতা ৪ – ৫ ইঞ্চি হওয়া এবং ফ্রাইগুলোর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের গভীরতা ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। তবে জলের গভীরতা যেন কোনও সময় ৮ ইঞ্চির উপর না হয়। এই লালন ট্যাঙ্কে ফ্রাইকে আরও ১২ – ১৫ দিন রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে এরা ৩ – ৪ সেন্টিমিটার হয়ে যায় এবং ওজনে ১ – ১.৫ গ্রাম হয়।

ডিমপোনা ও তার পরিচর্যাঃ

হ্যাচলিং দশা শেষ হওয়ার পর এরা খাবার খেতে শুরু করে। এই অবস্থাকে ডিমপোনা বা স্পন বলে। হ্যাচিং পুল বা ট্যাঙ্ক থেকে এদের সাইফনিং পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে লালন ট্যাঙ্কে রাখা হয়। এই প্রক্রিয়া অতি সাবধানে করা

দরকার কারণ স্পন অতি ক্ষুদ্র ও অল্প বয়সের হওয়ার জন্য মারা যাওয়া বা আঘাতজনিত সমস্যা দেখা যেতে পারে। লালন ট্যাঙ্ক সিমেন্টের বা ফাইবারের হতে পারে। এদেরও জল প্রবেশ ও নির্গমনের দ্বার থাকবে। দ্বারের মুখে সূক্ষ্ম জাল থাকবে যাতে স্পন বেরিয়ে যেতে না পারে। লালন ট্যাঙ্কে প্রতি বর্গমিটারের ১৫০০ – ২০০০টি স্পন রাখা যায়। ট্যাঙ্কে সর্বক্ষণ জলের নিরবচ্ছিন প্রবাহ থকা দরকার। খাবার দেওয়ার সময় ২ ঘণ্টা জল পরিবর্তন বন্ধ রাখতে হবে যাতে এরা সহজে খাবার খেতে পারে। খাবার হিসাবে ১০ – ১৫ দিন পর্যন্ত জীবন্ত প্রাণীকণাই (জুপ্লাঙ্কটন) ভালো। দিনে ২ – ৩ বার এই খাবার প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। প্রতি দিন কমপেক্ষ ২ বার মরে যাওয়া প্রাণীকণাকে ট্যাঙ্ক থেকে সাইফন করে বের করে দেওয়া দরকার। প্রতি লিটার জলে ২ – ৩ মিলিলিটার প্রাণীকণা স্পনের খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। খুব ছোট অবস্থায় ১০ – ১২ দিন পর্যন্ত এদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র সৃষ্টি হয় না বলে ট্যাঙ্কে জল পরিবর্তন করা খুবই জরুরি এবং জলে অক্সিজেন দ্রবীভূত করার জন্য অ্যারেশন বা বায়ুপূরণের ব্যবস্থা করা দরকার।

আফটার স্কুলে বদ্ধ জলশয়ে কৃত্রিম ভাবে মাছের ডিম ফোটানোর প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন, পুরুষ ও স্ত্রী মাছ (১ কেজি ওজনের, ১ বছর বয়সী), চুন, মহুয়া খোল ডিম ফোটানোর হর্মোণ যেমন - ওভাপ্রিম, ওভাটাইড, গনপ্রো ইত্যাদি, ১২ ফুট লম্বা, ৬ ফুট চওড়া ও ৪ ফুট উচ্চতাযুক্ত ব্রিডিং হাপা – ২ টি, পাতলা সুতি/মার্কিন কাপড়ে প্রবস্তুত ৪-৫ হাত লম্বা ৪ হাত চওড়া, ৩ হাত উচ্চতা সম্পন্ন আউটার হাপাঃ ৬ – ৮ টি , চটের বস্তা, সূঁচ, সুতা, লাইটের ব্যবস্থা, থালা দাড়িপাল্লা, সাউন্ড স্পিকার, এল.সি.ডি. ইত্যাদি।

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৩ঘঃ ৩০মিঃ

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১০ মিনিট
২)	কৃত্রিম প্রজনন কি এবং তার গুরুত্ব	১৫ মিনিট
৩)	ব্রিডিং ও আউটার হাপা সম্পর্কে ধারণা	১৫ মিনিট
৪)	পুরুষ ও স্ত্রী মাছ চেনা ও প্রজনন প্রক্রিয়ার জন্য উপযুক্ত মাছ চিহ্নিতকরণ কৌশল	২০ মিনিট
৫)	ইঞ্জেকশন (পরিমাণ, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া) সম্পর্কে সম্যক ধারণা	২০ মিনিট
৬)	আতুর পুকুর	২০ মিনিট
৭)	প্রশ্নোত্তর পর্ব	১০ মিনিট
৮)	আলোচিত বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষার্থীদের একটি লিফলেট বিতরণ	৫ মিনিট
৯)	প্রজনন পদ্ধতি নিয়ে বিশদ আলোচনা	১৫ মিনিট
১০)	মাছের প্রণোদিত প্রজননের উপর একটি ভিডিও “আশার আলো”	২০ মিনিট
১১)	প্রশ্নোত্তর পর্ব	২০ মিনিট
১২)	হাতে কলমে প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষার্থীরা নিজ নিজ হাতে মাছ চিনবে, ইনজেকশন করবে)	৩০ মিনিট
১৩)	অন্তিম পর্বের প্রশ্নোত্তর পর্ব	১০ মিনিট

বদ্ধ জলাশয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশি মাছের ডিম থেকে পোনা তৈরি

(১) কৃত্রিম প্রজনন কি?

প্রকৃতির নিয়মে নদী, নালা ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রজাতি মাছের প্রজনন হয়ে থাকে। যে প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশেষ একটা সময়ে, বিশেষ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে বদ্ধ জলাশয়ে স্ত্রী ও পুরুষ মাছের ইনজেকশন দিয়ে প্রজনন ঘটিয়ে ডিম থেকে পোনা তৈরি করা হয় তাকেই কৃত্রিম প্রজনন বলা হয়।

(২) কৃত্রিম প্রজনন কেন?

বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণভাবে নদীতে ডিম পাওয়া যায় না। আগে নদী ও গঙ্গার পোনা/ ডিম থেকে বিভিন্ন ধরণের মাছ পাওয়া যেত। তাছাড়া ঐ ডিম বা পোনা থেকে এক বছরে কমপক্ষে ১ কেজি পর্যন্ত ওজন হত। কারণ ওখানে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ গুলি খুবই বড়। বর্তমানে হ্যাচারী থেকে যে সমস্ত ডিম বা পোনা পুকুরে ফেলা হয় সেই সমস্ত মাছ বছরে ২৫০ গ্রাম থেকে খুব বেশী হলে ৫০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। হ্যাচারীতে এরা ব্যবসা করার জন্য যে কোন ওজনের স্ত্রী পুরুষ মাছের ডিম/পোনা তৈরি করে এছাড়াও এক ধরণের মাছ বলে আর এক ধরণের মাছ হয়। যেমন- কাতলা বলে চাষিকে বিক্রি করা হয় মৃগেল। কৃত্রিম প্রজননে, সঠিক বয়সের মাছ, সঠিক ওজন ও সঠিক জাতের মাছ নেওয়া হয় যার ফলে আমরা সঠিক মাছ পেতে পারি।

(৩) কৃত্রিম প্রজননের জন্য উপকরণ

স্ত্রী-পুরুষ মাছ, ইনজেকশন সূঁচ ও সিরিঞ্জ, নাইলন বিডিং, হাপা ২টি, সুতির ৬-৮টি হাপা, বাঁশের খুঁটী, মাছ ধরার জন্য জাল, বড় হাড়ি, চটের বস্তা, সূচ সুতো, লাইটের ব্যবস্থা, থালা, দাড়িপাল্লা ইত্যাদি।

১) বিডিং হাপা- ২টি

২) আউটার হাপা- ৬-৮টি

৩) এ্যালুমিনিয়ামের হাড়ি- ২টি

(৩) পুকুর নির্বাচন-

আলো ছায়া পুকুর, পুকুরে দেশি মাছ ছাড়া অন্য কোন মাছ থাকা চলবে না। পুকুরের জলে বেশী খাবার থাকা চলবে না। বাইরের জল যাতে পুকুরে না ঢোকে সেটি খেয়াল রাখতে হবে। পুকুরে কম পক্ষে ৪ থেকে সাড়ে ৪ ইঞ্চি জল থাকবে।

মাছের ডিম তৈরি করার ৭ দিন আগে বিঘা প্রতি ২০ কেজি চুন ১ দিন জলে ভিজিয়ে দিতে হবে।

(৪) মাছ নির্বাচন

স্ত্রী ও পুরুষ মাছ কম পক্ষে ১ বছর বয়সী ও ১ কেজি সবল, সুস্থ ও নীরোগ মাছ হওয়া দরকার। এই পদ্ধতিতে ২.৫০০ কেজি থেকে ৩ কেজি ওজনের বেশী বড় মাছ না নেওয়া উচিত। কারণ হ্যান্ডেল করা খুব অসুবিধা।

প্রতি কেজি কাতলা মাছের ডিমের সংখ্যা – ৭০-৮০ হাজার

প্রতি কেজি মৃগেল মাছের ডিমের সংখ্যা – ১লাখ থেকে ১লাখ ২০হাজার

প্রতি কেজি রুই মাছের ডিমের সংখ্যা – ৮০হাজার থেকে ১লাখ

(৫) ব্রিডিং হাপার মাপ

মিহি, ঘন, নাইলন- ১২ফুট লম্বা ৬ ফুট চওড়া ৪ ফুট উচ্চতা। উপর নীচ চারদিক বন্ধ থাকবে। কেবল মাত্র একটা কোনাতে দুই দিকে ১ হাত/ ১ হাত খলা থাকবে। কারণ মাছ ঢোকান ও বের করার জন্য। হাপার ৪ দিক অবশ্যই কাপড়ের লেস দিয়ে সেলাই করতে হবে। প্রতি কোনাতে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধার জন্যে কাপড়ের দড়ি সেলাই করে দিতে হবে।

(৬) আউটার হাপা

পাতলা সুতি/মার্কিন কাপড় ৪-৫ হাত লম্বা ৪ হাত চওড়া, ৩ হাত উচ্চতা। ঠিক উল্টো মশারির মত। এর ওপরে কোন ঢাকা থাকবে না। ঠিক আগের নাইলন হাপার মত সেলাই করতে হবে। এবং চার কোনায় বাঁধার জন্যে সুতির দড়ি সেলাই করে দিতে হবে।

(৭) ইনজেকশনের নাম ও পরিমাপ

বিভিন্ন ধরণের হর্মোন ইঞ্জেকশন বাজারে পাওয়া যায় তবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল ওভাপ্রিম, ওভাটাইড, গনপ্রো ইত্যাদি

(ক) প্রতি কেজি রুই ও মৃগেল স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে ০.০৫ এম.এল

(খ) প্রতি কেজি রুই ও মৃগেল পুরুষ মাছের ক্ষেত্রে ০.২ এম.এল

(গ) প্রতি কেজি কাতলা স্ত্রী মাছের ক্ষেত্রে ০.৩ - ০.৪ এম এল

(ঘ) প্রতি কেজি কাতলা পুরুষ মাছের ক্ষেত্রে ০.২ এম এল

(৮) ইনজেকশন দেওয়ার পদ্ধতি

৯০ ডিগ্রী কোণাকোনী ভাবে পায়ু ছিদ্রের সোজাসুজি স্পর্শ রেখার উল্টো দিকে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে ইন্‌জেক্‌শন কিন্তু ঠিক পেটের উল্টো দিকে দিতে হবে কখনো যেন পেটের দিকে না হয়। পেটের দিকে হলে ডিমের ক্ষতি হতে পারে।

(৯) সহজভাবে স্ত্রী/পুরুষ মাছ চেনার উপায়

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে মাছের পেট দেখে সহজেই চেনা যায় স্ত্রী/পুরুষ মাছ। এছাড়াও চেনা যায় মাছের মাথার নীচে যে পাখনা দুটি থাকে সেই পাখনা দুটির মধ্যে যে কোন একটি পাখনাকে বুড়ো আঙুল ও তার পাশের আঙুল দিয়ে ধরে উপর নীচে ঘস্লে যদি শিরিস কাগজের ঘসঘস করে তাহলে জানতে হবে ওটা পুরুষ মাছ আর যদি মসৃণ হয় তাহলে জানতে হবে স্ত্রী মাছ।

(১০) হাপাতে স্ত্রী ও পুরুষ মাছের অনুপাত

স্ত্রী মাছ ৩টি এবং পুরুষ মাছ ২টি, এই অনুপাতে দিলে মাছের ফারটিলাইজেশনটা ভালো হয়। তাছাড়া প্রতি জীবের মধ্যে বন্ধ্যা আছে। এই জন্যে একটা পুরুষ মাছ দিয়ে করা উচিত নয়।

(১১) উপযুক্ত সময়

জ্যৈষ্ঠ মাসের ৩য় সপ্তাহ থেকে আষাঢ় মাসের ১ম সপ্তাহ।

(১২) প্রজনন পদ্ধতি

যেদিন কাজটি করা হবে সেদিন যদি আকাশ মেঘলা হয় বা ঝির ঝির বৃষ্টি হলে ভালো হয় কারণ তাপমাত্রা ঐ ৪ দিন ২৮ – ৩০ ডিগ্রি থাকা দরকার। বেশী তাপমাত্রা হলে ডিম থেকে রেণু আসবে না। ডিম নষ্ট হয়ে যাবে।

এবার সকালের দিকে জাল নামিয়ে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ বাছাই করে নিতে হবে। স্ত্রী মাছ গুলি এমন ভাবে বাছাই করে নিতে হবে যেন অতিরিক্ত পেট ফোলা বা টল্টলে না হয়। মাছটা উল্টো করে ধরে দেখতে হবে পেটে ডিমের ছড়া দুটি দুটি পরিস্কার ভাঁজ। তাছাড়া স্ত্রী মাছের প্রজনন ছিদ্র হালকা গোলাপী রঙের হতে হবে। যদি প্রজনন ছিদ্র লাল হয় তবে সেই মাছ নেওয়া যাবে না। কারণ ঐরূপ মাছ নিলে তার ডিম পাশ হবে না। স্ত্রী পুরুষ বাছার পর একটি বিডিং হাপা টান টান করে জলের মধ্যে খাটাতে হবে। এমনভাবে খাটাতে হবে যেন হাপার নীচের অংশ মাটির মধ্যে লেগে না থাকে।

এর পর স্ত্রী ও পুরুষ মাছ গুলিকে (প্রয়োজন মত) ঐ ব্রিডিং হাপার মধ্যে ছেড়ে রাখা হয়। এরপর হাপার মুখটি সূচ সুতো দিয়ে সেলাই করে দিতে হবে। সেলাই না করলে মাছগুলি লাফিয়ে পালিয়ে যাবে। সন্ধ্যার দিকে আর একটি ব্রিডিং হাঁপা খাটিয়ে নিতে হবে ওই একইভাবে। চটের বস্তা ও সুতির কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে হাপা থেকে বড় হাড়িতে অল্প একটু জল দিয়ে হাপার মুখ খুলে দুটি দুটি করে মাছ তুলে আনতে হবে। আনার পর ওজন করে ঐ অনুপাতে ইনজেকশন দিয়ে অন্য হাপাটির মধ্যে ছড়ে দিতে হবে। দুটি হাপা না থাকলে কোন মাছে ইনজেকশন দেওয়া হল বোঝা যাবে না। এইভাবে পর পর সমস্ত মাছগুলিকে ইনজেকশন দেওয়ার পর দুটি হাপার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ অনুপাত ঠিক রেখে সমান ভাবে ছাড়তে হবে। ছাড়ার পর হাপার মুখটি সূচ সুতোর সাহায্যে সেলাই করে দিতে হবে।

মাছকে ইনজেকশন দেওয়ার সময় খুবই সাবধানে চটের বস্তার উপর ফেলে সুতির গামছা বা কাপড় ভিজিয়ে লেজ ও মাথায় ধরতে হবে।

৮-১০ ঘণ্টার মধ্যে হাপার মধ্যে ডিম ছড়ে দেবে। ডিম ছাড়ার সময় স্ত্রী ও পুরুষ মাছ হাপার মধ্যে পাশাপাশি ঘুরতে থাকে। এই সময় স্ত্রী মাছের ডিম ও পুরুষ মাছের শুক্র বের হতে থাকে। এই সময় নিষিক্ত হয়।

হলদে ডিমগুলি একেবারে সাগু সিদ্ধ হলে যেমন হয় ঠিক তেমনি থক থকে উজ্জ্বল হবে। অল্প একটু ডিম থালার মধ্যে নিয়ে দেখতে হয় কতটা পরিমাণ নিষিক্ত হয়েছে।

নিষিক্ত ডিম চেনার উপায় - চকচকে ডিমের ভিতর খুবই ছোট একটা হলদে রঙের টোপা দেখা যায়। এই টোপা

দেখেই বোঝা যায় ডিম কতটা পরিমাণ নিষিক্ত হল।

সন্ধ্যার সময় মাছের ইনজেকশন দেওয়া হয় কারণ সেই সময় একটু নিস্তব্ধাতার প্রয়োজন হয়। ৪-৫ ঘণ্টার মধ্যে মাছের যৌন উত্তেজনা শুরু হয়ে যায়। পুকুর পাড় থেকে চুপচাপ থেকে শুনলে হাপার মধ্যে মাছ লাফালাফি করছে শোনা যায়।

৮-১০ ঘণ্টা পর পুকুরের জলে নেমে হাপার পাশে গিয়ে ভালো করে হাপার ভিতরটি লক্ষ্য করলে সাদা সাদা ফেনা ও ডিম দেখা যায়। এই সময় মাছ একেবারে চুপ চাপ ও শান্ত হয়ে যায়। খুব সাবধানে হাপার মুখটির সেলাই খুলে মাছগুলিকে জলে ছেড়ে দিতে হবে। এরপর অতি সাবধানে ডিমগুলি হাড়ির মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে। ডিমগুলি খুবই নরম, বেশি চাপাচাপি করলে ডিম ভেঙে যাবে।

ডিম সংগ্রহের আগে সুতির ঐ আউটার হাপা গুলি লাইন করে টানটান করে খাটাতে হবে। খাটানোটা ঠিক উল্টো মশারির মত খাটাতে হবে। খাটানোর সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে নীচের দিকটা যেন মাটির সাথে লেগে না থাকে। উপরের দিকে কমপক্ষে ১০ ইঞ্চি জলের উপরে থাকে। উপরের অংশ জলে ডুবে থাকলে পোকামাকড় হাপার মধ্যে ঢুকে যাবেও ডিম থেকে রেনু বের হলে পুকুরের মধ্যে চলে যাবে।

এরপর হাঁড়িতে সংগ্রহ করা ডিম গুলি যত তাড়াতাড়ি পাড়া যায় (১ ঘণ্টার মধ্যে) ঐ সুতির হাপাতে পাতলা করে থালা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। ঐ পরিমাপের পরিমাণ অন্যায়ী প্রতি হাপাতে আনুমানিক ২-২.৫ লিটার।

ডিমগুলি ছড়ানোর পর দিনে ২ বার হাপার গা গুলিতে হাত বুলিয়ে দিতে হবে ও লক্ষ্য রাখতে হবে। ঐ অবস্থায় কাঁকড়াতে হাপা গুলি কেটে দিতে পারে। কেটে দিলে সমস্ত রেণু জলের মধ্যে চলে যাবে। তাতে কোন লাভ হবে না। খাটুনি বৃথা হবে। ৭২ ঘণ্টা পর ঐ রেণু হাপা থেকে সংগ্রহ করে আঁতুড় পুকুরে স্থানান্তরিত করতে হবে। ঐ ৭২ ঘণ্টা কোন খাবার লাগে না। রেনুর পেটের মধ্যে যে খাবার থাকে তাতেই ৭২ ঘণ্টা চলে যায়।

(১৩) আঁতুড় পুকুর তৈরি ও ডিম/রেণু থেকে পোনা তৈরি

(ক) পুকুরের আয়তন- ১০কাঠা জলের পরিমাণ – ৪ থেকে ৪১/২ ফুট

(খ) মহুয়া খইল – ২ থেকে ২১/২ ক্যুইন্টাল

(গ) চুন – ২০ লিটার

(ঘ) কেরাসিন তেল – আড়াই থেকে ৩ লিটার

আতুর পুকুর তৈরি – উপরোক্ত আয়তনের পুকুর হলে ও সেই পুকুরে ওই পরিমাণ জল থাকলে তাতে ২ থেকে আড়াই ক্যুইন্টাল মহুয়ার খইল ভালো করে ছড়িয়ে দিতে হবে। মহুয়ার খইলে সেপলিন নামক এক ধরণের পদার্থ থাকে, এই অবস্থায় জলকে নাড়া দিলে সার্ফের মত ফেনা হয় ও জলের মধ্যে অক্সিজেনের ঘাটতি হয় তার জন্য এই খোল ছড়ানোর কয়েক ঘণ্টা পর পুকুরের যাবতীয় মাছ, ব্যাঙ পোকা মাকড় সমস্ত রকম জলজ প্রাণী মারা যায় এবং এক সপ্তাহ পর জলের রঙ বাদামী হয়ে যায়।

১৫-১৮ দিন পর ২০ কেজি কলিচুন আগের দিন ভিজিয়ে রেখে জলের সাথে পাতলা করে রোদের সময় ভালো করে গোটা পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে। ৪৮ ঘণ্টা পর ঐ পুকুরে ডিম/ রেণু ছাড়া যাবে।

ডিম/রেণু ছাড়ার ১২ ঘণ্টা আগে আড়াই থেকে তিন লিটার কেরোসিন তেল গোটা পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেদিকে হাওওা দিচ্ছে সেই দিকে পুকুরের ধারে জলে ছড়িয়ে দিলে গোটা পুকুর হয়ে যাবে। এর ফলে পুকুরে যত ধরণের ডিম/রেণু খেকো পোকা থাকে তা সমস্ত মারা যাবে।

কেরোসিন দিয়ে ১২ ঘণ্টা পর ডিম/রেণু নিয়ে এসে আস্তে আস্তে জলের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হবে। তার পর পুরো হাঁড়িটা আস্তে আস্তে উল্টে দিতে হবে।

৪ কেজি সরিষার খইল ডিম ছাড়ার ১২ ঘণ্টা আগে ভিজিয়ে রেখে পাতলা করে গোটা পুকুর ছড়িয়ে দিয়ে তারপর ডিম/রেণু ছাড়লে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ডিম/রেণু ছাড়ার ১২-১৫ দিনের মাথায় পাতলা নেটের জাল দিয়ে পুকুরে টানতে হবে। ২১ দিনের ঘন নেট দিয়ে পুনরায় টান দিয়ে জালের মধ্যে ধানি পোনাগুলি কিছু বেঁধে রেখে পরে হাতের সাহায্যে জলের স্রোত দিয়ে ধানি পোনাগুলি জাল থেকে পুকুরে বের করে দিতে হবে। ঠিক এই ভাবে ২৮ দিনের মাথায় আবার টান দিতে হবে।

২৮ দিনের মাথায় অল্প কিছু ধানি থালায় নিয়ে দেখতে হবে যদি পোনাগুলি তড়বড় করে লাফালাফি করে তাহলে জানতে হবে পোনা ঠিক আছে আর যদি চুপ চাপ পড়ে থাকে তাহলে খুব ভালো পোনার পেট গুলি লক্ষ্য করতে হবে যদি পেট মোটা থাকে তাহলে জানতে হবে পোনাগুলি প্রচুর খেয়েছে তার জন্য ঘন ঘন ভালো করে নেট করতে হবে। এতে বোঝা যায় পুকুরে প্রচুর খাবার আছে। আর যদি দেখা যায় পেট খালি আছে তাহলে জানতে হবে পুকুরে পরিমাণ মত খাবার নাই এই অবস্থায় তার জন্য প্রতি সপ্তাহে ৫ কেজি সরিষার খইল ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে পাতলা জলের মত করে পুকুরে ছড়িয়ে দিতে হবে।

লালন পুকুরের অবস্থা অনুযায়ী ৩০-৩৫ দিনের মাথায় ধানী স্থানান্তরিত করা যেতে পারে ও বিক্রিও করা যেতে পারে।

ধানি পোনা আঁতুড় পুকুর থেকে স্থানান্তরিত করার আগের দিন অবশ্যই ভালো করে নেট করতে। ৫-৬ বার ঠিক মত নেট না করলে কখনই ধানি পোনা স্থানান্তরিত করা যাবে না মাছ মারা যাবে।

আফটার স্কুলে ঘরোয়া ভাবে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন, এল.সি.ডি, স্পিকার

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ১ঘঃ ৩০মিঃ

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১০ মিনিট
২)	"বনৌষধি" – এর ধারণা ও বর্তমান পৃথিবীতে তার সঙ্কটজনক অবস্থা নিয়ে আলোচনা	১০ মিনিট
৩)	"ঘরোয়া ভাবে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার" – এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা	১০ মিনিট
৪)	পাওয়ারপয়েন্টের মাধ্যমে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভেষজ উদ্ভিদের প্রদর্শন (kichu common vesoj udvid.ppt) ও আলোচনা	২০ মিনিট
৫)	"ঘরোয়া ভেষজ বাগান" – এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা	১০ মিনিট
৬)	ভিডিও দেখানো হবেঃ jhagrajhati- mpeg"	১০ মিনিট
৭)	আলোচনা ও প্রশিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
৮)	প্রশিক্ষার্থীদের "সাধারণ ধারণা" হ্যান্ডবিল বিতরণ	৫ মিনিট
৯)	ধন্বন্তরী ভেষজ "সজনে"-এর গুণাগুণ নিয়ে একটি ভিডিও প্রদর্শন এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	১৫ মিনিট
১০)	"চিরতা"-এরগুণাগুণ নিয়ে একটি ভিডিও প্রদর্শন এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	১০ মিনিট
১১)	ঘরোয়া বাগানের জন্য বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদের গুণাগুণ সম্বলিত একটি পুস্তিকা বিতরণ ও সেই পুস্তিকা নিয়ে আলোচনা	২৫ মিনিট
১২)	আলোচনার বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে পর্যালোচনা ও অন্তিম পর্বের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২৫ মিনিট

ঘরোয়া ভাবে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার

পৃথিবীতে স্থলের আদি বাসিন্দা উদ্ভিদকুল। আর এই উদ্ভিদকুল আমাদের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সৌন্দর্য সচেতনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভেষজ গাছপালার সঙ্গে পরিচিত। ভেষজ গাছের লতা, পাতা, বাকল, ফলমূল আদিকাল হতে বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রূপচর্চায় ভেষজ উদ্ভিদ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। আজও বর্তমানকালের অত্যাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেই বললেই চলে। তাই অজো-পাড়াগাঁয়ে এই ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদা আজও ব্যাপক। গ্রামের মানুষ জানে কোন গাছের কোন অংশ কোন অসুখে কাজ করে। সে অনুযায়ী তারা চিকিৎসা করে।

মানব দেহের সুস্থতার জন্য জৈব বা প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত খাদ্য দ্রব্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদনে বেড়ে যাচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার । শুধু খাদ্য শস্যই না প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে বিপুল ভেষজ ভাণ্ডার যা হাজার বছর ধরে মানুষ ব্যাবহার করে আসছে সুস্থ-সুন্দর জীবনের জন্য কিন্তু অতি ব্যবহারে বর্তমানে সেই সম্পদ হয়ে উঠছে বিপন্ন তাই এদের নিধন না করে আমাদের বেশি করে বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছ লাগানো উচিত কারণ ভেষজ উদ্ভিদের ওষুধে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে না।

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ রয়েছে কিন্তু কোন উদ্ভিদে কি গুন তা আমরা সবাই জানি না।প্রত্যকটি

ভেজষ উদ্ভিদেরই কিছু না কিছু ঔষধী গুন রয়েছে। দেশের উদ্ভিদকুলের ভিতরে প্রায় সাড়ে পাঁচ শ প্রজাতির উদ্ভিদ, ঔষধি বা ভেষজ প্রজাতির উদ্ভিদ। ঔষুধ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ভেষজ উদ্ভিদের চাহিদা সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইউনানি, আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি ওষুধ উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি বিউটি পার্লার ও প্রসাধনীতে এখন প্রচুর ভেষজ উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে। স্বল্প সময়ে, কম জমিতে অধিক হারে উৎপাদন করে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব এমন ঔষধি রয়েছে ২৫টির মতো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পুদিনা, ঘৃতকুমারী, থানকুনি, অর্জুন, আমলকী, হরীতকী, কালমেঘ, নিম, বহেড়া, কালিজিরা, বসাক, উলটকমল, অশ্বগন্ধা, সর্পগন্ধা, তুলসী, মেথি, সোনাপাতা, যষ্টিমধু, বাবলা, শতমূলী, ইসবগুল, আদা, রসুন, হলুদ, পিঁয়াজ ইত্যাদি।

WHO (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন) দ্বারা প্রণয়ন করা হয়েছে, যেসব গাছের এক বা একাধিক অংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে দরকারি ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে Medicinal plant বা ঔষধি গাছ বলে। গাছ যদি হয় বিভিন্ন রোগের ঔষধ, তখন তাকে ছোটখাট হাসপাতাল বলাই যায়। কিন্তু সঠিক ব্যবহার না জানলে এই ঔষধ, রোগের উপশমের বদলে বিষে রূপান্তরিত হবে।

বাঁচাতে হবে বনৌষধিঃ

সাধারণ স্বাস্থ্যের স্থিতিশীলতার স্বার্থে প্রথাগত চিকিৎসার জ্ঞান ও ভাবনা, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ভাবনার সংমিশ্রণে অঞ্চলভিত্তিক সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান নির্ধারণ প্রয়োজন। ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হয়ে তার ৩২ কোটি ৯০ লক্ষ হেক্টর ভূভাগের সাড়ে ৭ কোটি হেক্টর বনভূমি নিয়ে উদ্ভিদ বৈচিত্রে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ বলে পরিচিত। এ দেশে সনাক্তকৃত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৪৫০০০ যার মধ্যে ১৭৫০০টি উদ্ভিদ প্রজাতি সপুষ্পক এবং ২৫৬১টি প্রজাতি বৃক্ষ শ্রেণির উদ্ভিদ। সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভেষজ ও সুগন্ধী তেলের উৎস উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৮০০০। আধুনিক ঔষধ ও প্রসাধন-সামগ্রীতেও অনেক বনৌষধি ব্যবহার কর হয়। রাসায়নিক ঔষধের তুলনায় অধিকতর নিরাপদ ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন হওয়ায় উদ্ভিদজাত ভেষজ পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও ক্রমাগত জনপ্রিয় হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) স্বীকৃতিতে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে নতুন নতুন ওষুধের সন্ধানে প্রথাগত প্রজ্ঞা-নির্ভর ওষধি গাছপালা যেমন নয়নতারা, ট্রাকসাস, পপি, কপটিস, অগুরু প্রভৃতির মতো উদ্ভিদসমূহ অর্থনৈতিক লাভের প্রলোভনে আজ বিপন্ন। এ দেশে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক এই রকম উদ্ভিদ প্রজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে। তাই এই সব প্রথাগত প্রজ্ঞা লিপিবদ্ধ করা আশু প্রয়োজন, যা বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের মধ্যে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবে।

পৃথিবী ব্যাপী বনৌষধির এই ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক চাহিদার মূল উৎস হল উন্নয়নশীল দেশগুলির বনাঞ্চল। প্রতিটি দেশে বর্তমানে এই ভেষজ উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ছে, এদের চাহিদা মেটাতে বনৌষধি চাই। সর্বত্র তাই অবাধে বনৌষধির সংগ্রহ এবং ক্রয়-বিক্রয় চলছে। প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ - তাই দায়ভাগ নেই – তুললেই হল – নতুন চারা তৈরির দায়িত্ব প্রকৃতির। সংগ্রহের মাত্রা এখন বল্গাহীন, তাই প্রজাতির সংকট এখন প্রকট। সে জন্য বনৌষধি বাঁচাতে আশু প্রয়োজন ভেষজ উদ্ভিদের বাণিজ্যিক চাষ-আবাদ।

ঘরোয়া ভেষজ বাগান তৈরিঃ

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রতি পরিবারে একটি করে ঘরোয়া ভেষজ বাগান তৈরি করা প্রয়োজন যা ভেষজ উদ্ভিদের পুনরুজ্জীবন ও স্থানীয় প্রক্রিয়ায় তার ব্যবহার সুনিশ্চিত করবে। ঘরোয়া ভেষজ বাগান আমাদের সাধারণ অসুখ-বিসুখে ভেষজের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি পরিবেশকে সুন্দর ও সুস্থ রাখতে অনেকাংশে সাহায্য করে। রোগ-ব্যাধি সারানোর সাথে সাথে এই সব ভেষজ শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে তোলে। সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য প্রতি দিন এক জন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কমপক্ষে তিনশো গ্রাম ভেষজ গুণসম্পন্ন শাক-সবজি খাওয়া উচিত।

ঘরোয়া ভেষজ বাগান তৈরির জন্য যে বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার সেগুলো হল-

১) জমি নির্বাচন,

২) জমি তৈরি,

৩) বীজ নির্বাচন ও বীজতলা তৈরি,

৪) ভেষজ উদ্ভিদ নির্বাচন এবং

৫) রোগ ও পোকা দমন।

সাধারণত ঘরোয়া ভেষজ বাগানে উদ্ভিদকে পোকা মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করে ঘরোয়া পদ্ধতি ব্যবহার করাই ভালো। তাই প্রয়োজনে সকালে এই সব গাছের পাতায় একটু উনুনের ছাই ছড়িয়ে দিলে পিঁপড়ে বা অন্য পোকা মাকড় ধরে না। পোকা-মাকড় ধরা গাছে বাসক পাতা অথবা বনতামাক অথবা নিম বা নিসিন্দা সিদ্ধ জলে সাবান বা রিঠা ভেজানো জল মিশিয়ে গাছে ছিটিয়ে দিয়ে রোগ-পোকা দমন করা যায়। রোগ-পোকা দমনের ক্ষেত্রে কর্পূর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কর্পূর জলে গুলে ছড়িয়ে দিয়েও গাছের রোগ-পোকা দমন করা যায়।

গাছ বসানোর সময় মাটি বৈশিষ্ট্য যাচাই করে নেওয়া ভালো। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে মাটিতে ক্ষার বা অম্লের পরিমাণ কী রয়েছে। ক্ষারধর্মী মাটির বৈশিষ্ট্য পিএইচ-৯-এর বেশি, অম্লধর্মী মাটির বৈশিষ্ট্য পিএইচ-৭-এর নীচে। ঘরোয়া ভেষজ বাগান তৈরির সময় এই বিষয়গুলি ভালো দেখে নিয়ে গাছ বসানো ভাল।

হাইড্রোপনিক্স মিশ্রণ প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণঃ বোর্ড, ডাস্টার, চক বা বোর্ড পেন, হাইড্রোপনিক্স মিশ্রণ প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ , LCD এবং সাউন্ড সিস্টেম

দিন সংখ্যা – ১ দিন	সময় – ৪ঘঃ ১৫মি

ক্রঃ	বিষয়	সময়
১)	পরিচিতির মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত	১০ মিনিট
২)	হাইড্রোপনিক্স নিয়ে একটি ভিডিও “হাইড্রোপনিক্স.mp4” দেখানো হবে	৫ মিনিট
৩)	হাইড্রোপনিক্স সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা	২০ মিনিট
৪)	হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতির মাধ্যমে চাষের উপর একটি ভিডিও “হাইড্রোপনিক পদ্ধতি- mp4”	১০ মিনিট
৫)	হাইড্রোপনিক্স দ্রবণ প্রস্তুত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা (বোর্ড ও পেন সহযোগে)	৩৫ মিনিট
৬)	প্রশ্নোত্তর পর্ব	২০ মিনিট
৭)	ভিডিও দেখানো হবেঃ “_____ mp4”	২০ মিনিট
৮)	প্রশিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে হাইড্রোপনিক্স দ্রবণ প্রস্তুত করে ব্যবহার করবে	৬০ মিনিট
৯)	হাইড্রোপনিক্স – এর একটি পাওয়ারপয়েন্ট প্রদর্শণ ও ব্যাখ্যা	৪৫ মিনিট
১০)	প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৫ মিনিট
১১)	হাইড্রোপনিক্স – এর হ্যান্ডবিল বিতরণ	১৫ মিনিট

ঘন হাইড্রোপোনিক্স মিশ্রণ তৈরি

১) প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

- ২০ লিটার আয়তনের একটি প্লাস্টিকের পাত্র।
- ১০ লিটার পরিমাণের ৩টি প্লাস্টিকের বালতি।
- ১০ লিটারের দুটি বড় মাপের বোতল (demijohn)।
- ২ লিটারের একটি পাতনের ফ্লাস্ক, বা মেপে দেখার টিউব বা প্লাস্টিকের জার।
- ০.০১ থেকে ২০০০ গ্রাম পর্যন্ত মাপার স্কেল।
- কাঁচের বা PVC-র গোলানোর দণ্ড (একটি তিন চতুর্থাংশ নলের টুকরো)।
- দুটো লম্বা হাতলওয়ালা প্লাস্টিকের চামচ (একটি বড় ও একটি ছো।
- প্রত্যেকটি উপকরণ মাপার জন্য কাগজ।
- ওজন করা জিনিস জমা রাখতে ছোট প্লাস্টিকের পাত্র (কাপ)।

২) ঘন দ্রবণ 'ক' তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ

নিম্নলিখিত জিনিসগুলোকে অবশ্যই ভাল স্কেলে ওজন করতে হবে।

মনো অ্যামোনিক ফসফেট (১২-৫২-০)

৩৪০ গ্রাম

ক্যালসিয়াম নাইট্রেট

২০৮০ গ্রাম

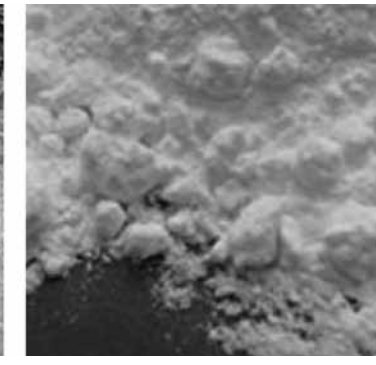

পটাসিয়াম নাইট্রেট

১১০০ গ্রাম

৩) 'ক' দ্রবণ তৈরির পদ্ধতি

প্রথমে প্লাস্টিকের পাত্রে ৬ লিটার জল নিন এবং আগেই পরিমাপ করে রাখা উপরের উপকরণগুলো তালিকা অনুযায়ী একে একে এতে যোগ করুন এবং ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। প্রথম পরিপোষক পদার্থ সম্পূর্ণ গুলে গেলে তবেই দ্বিতীয়টি মেশান এবং যখন প্রথম দুটি পরিপোষক পদার্থ সম্পূর্ণ মিশে যাবে তখনই তৃতীয়টি যোগ করতে হবে। দ্রবণের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০ লিটার হওয়া পর্যন্ত তাতে জল মেশান এবং আরও ১০ মিনিট তা নাড়ুন, যতক্ষণ তাতে কোনও কঠিন পদার্থ উপস্থিত থাকে। এবার আমরা ঘন ক দ্রবণ পেয়ে গেলাম, যা অবশ্যই ১০ লিটারের বড় মাপের বোতলে (demijohn) ঢেলে, লেবেল লাগিয়ে ঠান্ডা ও অন্ধকার জায়গায় রেখে দিতে হবে।

ঘন দ্রবণ খ

১) ৪ লিটারের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপকরণ

প্রথম বিভাগ

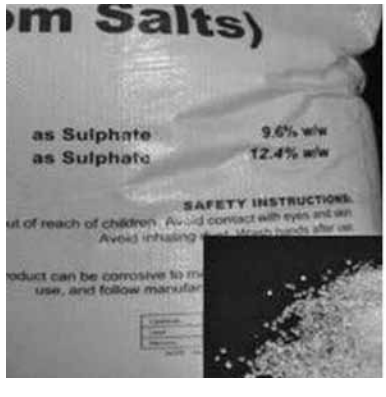

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট

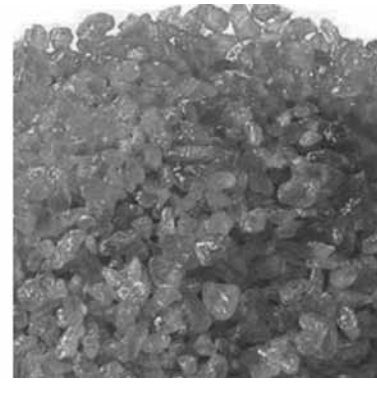

কপার সালফেট

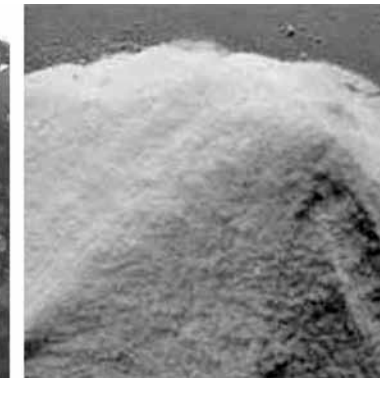

ম্যাঙ্গানিজ সালফেট

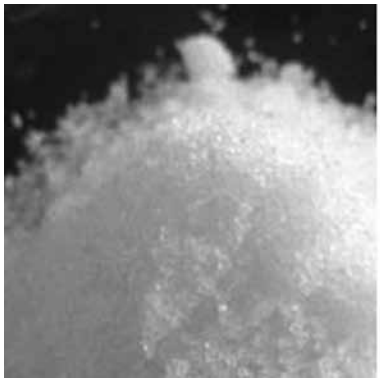

৪৯২ গ্রাম

জিঙ্ক সালফেট

১.২০ গ্রাম

০.৪৮ গ্রাম

বোরিক অ্যাসিড

৬.২০ গ্রাম

২.৪৮ গ্রাম

অ্যামোনিক মলিবডেট

০.০২ গ্রাম

দ্বিতীয় বিভাগ

ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট

৪৭০ গ্রাম

আয়রন শেলেট

৮.৪৬ গ্রাম

২) 'খ' দ্রবণ তৈরির পদ্ধতি

প্লাস্টিকের পাত্রে ২ লিটার জল নিন এবং আগেই পরিমাপ করে রাখা উপরের প্রথম বিভাগের উপকরণগুলো তালিকা অনুযায়ী একে একে এতে যোগ করুন: প্রথম উপকরণ সম্পূর্ণ গুলে যাওয়ার আগে দ্বিতীয় উপকরণ যোগ করা হবে না এমনটাই কাম্য।

তারপর, সারাক্ষণ নাড়ুন এবং ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট যোগ করতে হবে। শেষে আমরা দানাদার বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত আয়রন শেলেট, যা "Secuestrene Hierro 138 (R)" নামে পরিচিত, যদিও বাজারে তরল অবস্থার যে একাধিক আয়রন শেলেট পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করাই শ্রেয়।

এরপর আমরা আরও ১০ মিনিট দ্রবণটিকে নাড়তে থাকব, যতক্ষণ না সব উপকরণের কঠিন পদার্থগুলো গুলে যাচ্ছে: তারপর দ্রবণের পরিমাণ স্থির করতে ৪ লিটার পর্যন্ত তাতে জল দিন এবং আরও ৫ মিনিট ধরে নাড়ুন।

এই হল, ঘন তরল খ, যার মধ্যে ৯টি পরিপোষক পদার্থ রয়েছে।

পর্যবেক্ষণ

- তালিকায় উল্লিখিত পরিমাণগুলো বজায় রাখাই ভাল, কারণ বিষক্রিয়ায় ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

- এই দ্রবণ তৈরির জন্য ২০-২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সাধারণ জল ব্যবহার করতে হবে, যদিও দামের খুব হেরফের না হলে পাতিত জল ব্যবহার করা বেশি ভাল।

- দ্রবণটি তৈরি করতে, মজুত রাখতে ও নাড়তে, ঘনীভূত করতে বা ইতিমধ্যে পুষ্টিকর অবস্থায় থাকা মিশ্রণের ক্ষেত্রে সর্বদা প্লাস্টিক বা কাঁচের জিনিস ব্যবহার করা উচিত; কখনই ধাতুর বা কাঠের দণ্ড ব্যবহার করা উচিত নয়, তবে ৫০ ইএম লম্বা PVC নল ব্যবহার করা যেতে পারে।

গাছে ব্যবহারের জন্য পুষ্টিকর দ্রবণ তৈরি

এক্ষেত্রে দুটো সুপারিশ করা হয়ে থাকে, যা শুরু থেকে জানা দরকার:

১. জল ছাড়া ঘন দ্রবণ ক-কে কখনই ঘন দ্রবণ খ-এর সঙ্গে মেশানো যাবে না, কারণ এরফলে ওই দ্রবণ দুটির পুষ্টিকর উপাদানগুলোর বেশিরভাগটাই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, যার কারণে মিশ্রণের প্রভাব ফসলের উপকারের পরিবর্তে ক্ষতিসাধন করবে। মিশ্রণটি অবশ্যই জল দিয়ে তৈরি করতে হবে, প্রথমে একটি এবং তারপরে অন্যটি যুক্ত করুন।

২. প্রতি ১ লিটার পুষ্টিকর মিশ্রণ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে যে মূল অনুপাতটি মেনে চলা উচিত তা হল, প্রতি লিটার জলে ঘন খ দ্রবণের প্রতি দু'ভাগে (২) পাঁচভাগ (৫) ঘন ক দ্রবণ (নীচের সারণী দেখুন)। পরে, অভিজ্ঞতা মতো পরিমাপ করে মিশ্রণের ঘনত্ব হ্রাস করা যেতে পারে, নীচে দেখানো ৫:2 অনুপাত সর্বদা বজায় রাখুন:

কঠিন নিম্নস্তরের পুষ্টিকর মিশ্রণ

কঠিন অংশের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা গাছে সরাসরি প্রয়োগ করতে পুষ্টিকর মিশ্রণ তৈরি:

মনে রাখতে হবে, ঘন মিশ্রণ প্রয়োগের ডোজ যাই হোক দ্রবণ ক ও দ্রবণ খ-এর অনুপাত সব সময় একই থাকবে।

ঘনত্ব		পরিমাণ	
	ঘনত্ব	পুষ্টিকর দ্রবণ 'ক'	ঘন দ্রবণ 'খ'
সম্পূর্ণ/মূল	সম্পূর্ণ/মূল	৫.০ সিসি	২.০ সিসি
অর্ধেক	অর্ধেক	২.৫ সিসি	১.০ সিসি
এক চতুর্থাংশ	এক চতুর্থাংশ	১.২৫ সিসি	০.৫ সিসি

ক) প্রয়োগ

যদি গরম আবহাওয়ার ছোট চারায় (অঙ্কুরোদ্গমের প্রথম দিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে) বা সদ্য স্থানান্তরিত হওয়া চারাগাছে (স্থানান্তরের প্রথম থেকে সপ্তম দিনের মধ্যে) পুষ্টিকর মিশ্রণ ব্যবহার করতে হয়, তবে সেক্ষেত্রে অর্ধঘন মিশ্রণ (প্রতি লিটার জলে পরিপোষক দ্রবণ ক-এর ২.৫ সিসি এবং পরিপোষক দ্রবণ খ-এর ১ সিসি) ব্যবহার করতে হবে। এই অর্ধঘন পুষ্টিকর মিশ্রণ অধিক তাপমাত্রায় ও প্রখর রোদের সময় দিতে হয়, কারণ এই

মরসুমগুলোয় পুষ্টিকর উপাদান অপেক্ষা জলের প্রয়োজন অনেক বেশি থাকে।

তবে সম্পূর্ণ বা মূল ঘন (প্রতি লিটার জলে ৫:২ অনুপাতে তৈরি) মিশ্রণটিকে অবশ্যই অল্প পুরনো গাছের (অঙ্কুরোদ্গমের দশম দিনে বা স্থানান্তরের সপ্তম দিনে) ব্যবহার করতে হয়। এই অনুপাতে তৈরি মিশ্রণ মেঘাচ্ছন্ন শীতের মরসুমে ব্যবহার করা ভাল, কারণ এই সময়ে গাছ অনেক বেশি পরিমাণে পরিপোষক পদার্থ গ্রহণ করতে পারে।

জলে পশুখাদ্য জাতীয় শস্য ফলাতে প্রতি লিটার জলে ১.২৫ সিসি দ্রবণ ক ও ০.৫ সিসি দ্রবণ খ দিয়ে তৈরি মিশ্রণ ব্যবহার করতে হয়, বীজের অঙ্করোদ্গমের একদিন পর থেকে সেচ দেওয়া শুরু করতে হয়।

ছবিতে হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে চাষ

খ) প্রতি বর্গমিটারে পুষ্টিকর মিশ্রণের পরিমাণ

প্রতি বর্গমিটার পরিমাণ জায়গার গাছের জন্য ২.০ থেকে ৩.৫ লিটার কোন ঘনত্বের পুষ্টিকর মিশ্রণ প্রয়োগ করা হবে তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

শীতে বা ঠান্ডা আবহাওয়ায় গাছ যখন ছোট থাকে তখন সবচেয়ে কম পরিমাণের পুষ্টিকর মিশ্রণটি ব্যবহার করা হয়, এবং গাছে যখন ফুল আসতে শুরু করে বা গাছের ব্যবহার যোগ্য ফসলের অংশগুলো (মূল, কন্দ, স্ফীত অংশ)

তৈরি হতে শুরু করে তখন সবচেয়ে অধিক মাপের মিশ্রণটিকে ব্যবহার করতে হয়।

লক্ষ্য করা গেছে যে, অধিক তাপমাত্রা বা প্রচুর হাওয়া অথবা জলধারণ ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে গাছ যে কঠিন অংশে দাঁড়িয়ে থাকে দিনের বেলায় তা শুকিয়ে যায়, এক্ষেত্রে পরিপোষক পদার্থ না মিশিয়ে কিছু বাড়তি জল দিতে হয়। এই বাড়তি জল প্রয়োগ খুব জরুরি, কারণ গাছ যার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে তা শুকিয়ে গেলে সেখানে পরিপোষক পদার্থ থাকলেও গাছ সেইসব শোষণ করতে পারে না।

মিশ্রণের ঘনত্ব, কতটা পরিমাণে তা প্রয়োগ করতে হবে এবং ভাল পুষ্টির অন্যান্য বিবরণে কিছু পরিবর্তন আসতেই পারে, যা অর্জিত অভিজ্ঞতা ও শস্য ফলাতে বৃদ্ধি পাওয়া সক্ষমতা এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকেদের পরামর্শে হতে পারে।

উদাহরণ:

কঠিন অংশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছে প্রস্তুত করা ১০ লিটারের পুষ্টিকর মিশ্রণ প্রয়োগ করা যেতে পারে (যা ৩.৫ থেকে ৫.০ বর্গমিটারের গাছে সেচে যথেষ্ট হওয়া উচিত, তবে গাছের বয়স এবং মরসুমে কোন তাপমাত্রায় প্রয়োগ করা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে)।

একটি প্লাস্টিকের বড় জায়গায় ১০ লিটার জল নিতে হবে। যাতে ৫০ সিসি ঘন দ্রবণ ক যুক্ত করে নাড়তে হবে এবং তারপর ২০ সিসি ঘন দ্রবণ খ দিয়ে আবার নাড়তে হবে। এভাবে আমরা শস্যতে ব্যবহারের জন্য পুষ্টিকর মিশ্রণ পেয়ে যাব। এই মিশ্রণটিকে উপর দিকে ছিদ্রযুক্ত জল দেওয়ার পাত্রে বা প্লাস্টিকের বোতলে ভরে রাখতে হবে এবং ধীরে ধীরে গাছে প্রয়োগ করতে হয়, কিনারার জায়গাসহ পাত্রের সব জায়গায় সমানভাবে দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, কিন্তু কখনই বাইরে নয়।

প্রতি বর্গমিটারে প্রস্তাবিত এই মিশ্রণ প্রয়োগের পরিমাণ প্রতিদিন ২ থেকে ৩.৫ লিটারের মধ্যে ওঠানামা করতে পারে। এই পরিমাণ মূলত গাছের বৃদ্ধি কোন অবস্থায় রয়েছে এবং আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে।

গ) কত ঘণ্টা, কত সময় অন্তর প্রয়োগ এবং অতিরিক্ত আংশ ধুয়ে ফেলা

প্রতিদিন অবশ্যই সকালের প্রথম ঘণ্টায় এই পুষ্টিকর মিশ্রণ (সেচ) প্রয়োগ করতে হবে, শুধু সপ্তাহে একদিন ছাড়া, ওইদিন দিনে দু'বার কোনও পরিপোষক পদার্থ ছাড়াই শুধু সাধারণভাবে জলসেচ দিতে হবে। গাছ যে কঠিন অংশে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে একসঙ্গে জমে থাকা বাড়তি লবণ এরফলে নিকাশির মাধ্যমে ধুয়ে যায়, কঠিন অংশে লবণ জমে থাকলে যে ক্ষতি হতে পারে এভাবে তা এড়ানো যায়।

প্রতিদিন সকালে সেচের পর নিকাশির মাধ্যমে অতিরিক্ত পুষ্টিকর মিশ্রণ পাত্র থেকে বের করে দিতে হয়, যা হয়তো দ্বিতীবার পুনরায় প্রয়োগ করা যেতে পারে। সপ্তাহের শেষে এই তরলকে আর ব্যবহার করা যায় না।

যদিও কার্যকরতার জায়গা থেকে এটি খুব ভাল নয়, খুব রোদ এবং ভীষণভাবে গরম এলাকায় সন্ধের সময় সেচ দিয়ে কিংবা পুষ্টিকর মিশ্রণের সেচ দেওয়ার পর সামান্য জল দিয়ে গাছে থেকে যাওয়া অতিরিক্ত মিশ্রণ ধুয়ে দিয়ে পাতা ফুলে ওঠা রোধ করা যেতে পারে।

‘...মানুষের কাছে যাও
তাদের মধ্যে থাকো
মানুষের কাছ থেকে শেখো
তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করো
মানুষের যা আছে সেটাকেই সমৃদ্ধ করো।
মনে রেখো, ...ভালো নেতা সেই
যার কাজ শেষ হয়ে গেলে
মানুষ বলে যে, আমরাই করেছি।’

AHEAD Initiatives
৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০ ০৩১, টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯